দক্ষিণ ভারতের আত্মমর্যাদা আন্দোলন: পেরিয়ার ই ভি রামাসামী ও তাঁর অগ্রজদের অবদান

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়*

সূচক শব্দ : জাতি (Nation), জাতপাত (Castes), নিপীড়িত শ্রেণি (Depressed Class)

উনবিংশ শতাব্দের ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি দিলে, তৎকালীন এই ব্রিটিশ উপনিবেশে বেশ কিছু চিন্তাধারার উদ্ভব অথবা পুনরুত্থান লক্ষ্য করা যায়। নিত্যনতুন ঐতিহাসিক আবিষ্কার, বিজ্ঞান চর্চার বিকাশ, পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাব, আধুনিক চিন্তাচেতনার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, পুরনো প্রথার সংস্কার এবং নতুন শিক্ষিত শ্রেণির আবির্ভাব ইত্যাদি নানান বিষয়ের ফলাফল রূপে সৃষ্ট এই সমস্ত চিন্তাধারাগুলি উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দের প্রারম্ভের সমাজ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই সময়ে জনশিক্ষার কিছুটা প্রসার ঘটেছিল ফলে যৌক্তিকতাবাদী দৃষ্টিতে সমাজ-ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে যাচাই করে নেওয়ার ক্ষেত্রে চিন্তাগত বিকাশ ঘটেছিল। সমাজে দেখা দিয়েছিল আধুনিক সংঘ, ক্লাব, সেবা-সমিতির মতো সামাজিক সংগঠন। এই সমস্ত চিন্তাধারাগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাধান্য বিস্তারকারী চিন্তাধারা হিসেবে যে দুটি ধারাকে চিহ্নিত করা যায়, — (১) জাতীয়তাবাদী ধারা- যার ঘোষিত মূল লক্ষ্য ছিল স্বরাজ ও স্বশাসন (যদিও উনবিংশ শতাব্দে এই ধারার দাবি স্বরাজ অথবা স্বাধীনতা ছিল না, স্বরাজের দাবি বিংশ শতাব্দেই প্রথম সামনে আসে), (২) আত্মমর্যাদার দাবিতে সমাজের নিম্নবর্ণ-অবর্ণ (অস্পৃশ্য বা দলিত) অংশের জনতার সমান অধিকার আদায়ের দাবিতে আন্দোলন, যার মধ্য দিয়ে হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত নিপীড়িত শ্রেণির মানুষ ব্রাহ্মণ্যবাদী অন্যায় ও শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার দিকে এগোতে শুরু করেছিল। এই ব্রাহ্মণ্যবাদ

* প্রাবন্ধিক ও সমাজকর্মী

অংশকে ইংরেজদের সহায়ক ও সুবিধাপ্রাপ্ত অংশ হিসাবে দেখলে ভুল হয় না।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে তোষামোদ করে দরকষাকষির মাধ্যমে কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করেছিল হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণ অংশ। পরবর্তীকালে এই উচ্চবর্ণীয়দের একাংশের নেতৃত্বেই গড়ে উঠেছিল জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাগুলি। বহু জাতির (Nation) ভূখণ্ড ভারতবর্ষে এই জাতীয়তাবাদীরা একটি রাজনৈতিক সংস্কারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে যে মতাদর্শ নির্মাণ করেছিল, তার কেন্দ্রীয় চেতনা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দের হিন্দু-ধর্ম পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের নব্য-বেদান্তবাদ। সেখান থেকেই বিকশিত হয়েছিল হিন্দুত্বের ধারণা এবং তাকেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই ধারণার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই 'জাতীয়তাবাদীরা' তাঁদের ব্রিটিশদের সঙ্গে দরকষাকষি এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন কর্মসূচিকে পরিচালনা করেছিলেন। ফলস্বরূপ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারার সঙ্গে যুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিলেন সমাজের উচ্চবর্ণ থেকে আগত এবং সমাজের নিপীড়িত শ্রেণির মানুষের মধ্যে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা ছিল ক্ষীণ।

১৭৫৭ তে মুসলিম শাসনের অবসানের পর ব্রিটিশদের পরিকল্পনায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত হিন্দু উচ্চবর্ণকে জমির মালিকানা দিয়েছিল। নিম্নবর্ণ ও অবর্ণ অংশের দরিদ্র মানুষ এই প্রক্রিয়ায় হয়েছিল আরো দরিদ্রতর। এইসময়পর্বে ব্রিটিশদের তোষামোদকারী যে নতুন জমিদারশ্রেণির জন্ম হয়েছিল, প্রজাপীড়নে ও শোষণে ইংরেজ শাসকের চেয়ে তারা কোনো অংশেই পিছিয়ে ছিল না। ফলে পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণের নেতৃত্বে শুরু হওয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি নিপীড়িত শ্রেণির আকর্ষণ ছিল অপেক্ষাকৃত কম।

অন্যদিকে সামাজিক সংস্কার আন্দোলনকে সামনে রেখে শুরু হওয়া দ্বিতীয় ধারাটি তার মতাদর্শ নির্মাণ করেছিল নিজেদের বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত জীবন জাতবোধ, নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও যুক্তিবাদী চিন্তাচেতনা থেকে। এই দ্বিতীয় ধারার আন্দোলনের নেতৃত্বরা নিজেদের ব্রিটিশ শক্তির চেয়েও ব্রাহ্মণ্য-আধিপত্যের কাছেই অধিক পরাধীন বলে মনে করতেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়েও সমাজবদ্ধ মানুষের স্বাধীনতাকে তাঁরা অধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখতেন। হিন্দু ধর্মীয়-সমাজের সংস্কার চেয়ে শুরু হওয়া এই আন্দোলনের নেতৃত্বরা অনেকেই ছিলেন পাশ্চাত্য দর্শন চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত। পাশাপাশি সেই সময়ের ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার, জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার বিকাশ তাঁদের প্রথাগত চিন্তাভাবনার সীমা লঙ্ঘন করতে ইন্ধন জুগিয়েছিল।

স্বাভাবিকভাবেই ঊনবিংশ শতাব্দের নিম্নবর্ণ ও অবর্ণ(পঞ্চম বর্ণ) অংশ থেকে উঠে আসা সমাজ সংস্কারকরা শুধু ব্রিটিশ শাসকদের প্রশ্ন করেই থেমে গেলেন না, ব্রিটিশ শাসনেও ভারতীয় সমাজে কীভাবে ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের আধিপত্য, প্রভাব পতিপত্তি টিকে আছে, কীভাবে শূদ্রাতিশূদ্ররা হিন্দু ধর্মীয় বর্ণ-ব্যবস্থা দ্বারা যুগযুগ ধরে শোষিত হয়ে আসছেন, কীভাবে তাঁরা সমাজের অন্ধকার অংশে দুর্দশাপূর্ণ জীবনযাপন করছেন, এই প্রশ্নগুলিকে তাঁরা সমাজ-রাজনৈতিক পরিসরে তুলতে শুরু করলেন। হিন্দু-ধর্মীয় সংস্কৃতি বা প্রথা, আচার, রীতিনীতি; যা ধর্মনীতির অংশ বলে মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতে কুণ্ঠাবোধ করছে,

সেই সমস্ত অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে রুখে দাঁড়ালেন এই সমস্ত সমাজ সংস্কারকরা। জাতপাত-বিভাজন এবং অন্যান্য নানান ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস বিরোধী অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকা সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্বরা, ভারত ভূখণ্ডের পুরাতন প্রথা, বিধিনিষেধ, জাতপাত-বিভাজন ইত্যাদিকে অর্থহীন ও মানবাধিকার অর্জনের পথে অন্তরায় হিসেবে ঘোষণা করে, সমাজে সমতা, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিমর্যাদার প্রশ্নটিকে সামনে আনলেন। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য(অবর্ণ) অংশের মেহনতি লোকেরা সমাজের জাতপাতগত অসাম্য ও তার ভিত্তিতে চলতে থাকা অন্যায়কে মূল শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করলেন।

এইসময় সমাজে গৌতম বুদ্ধের ইহজাগতিক চিন্তাভাবনার পুনরুত্থান, আধুনিক নৃগোষ্ঠীগত ইতিহাস রচনা ও সমাজবিজ্ঞানের নানান ধারার মতবাদগুলি আলোচ্য বিষয় হিসেবে উঠে আসায়, নিপীড়িত শ্রেণির শিক্ষিত অংশের সামনে এক নতুন ভাবনা প্রস্থান (School of Thought) নির্মাণের উপযুক্ত পরিস্থিতি হাজির হয়েছিল। এই সকল নতুন আবিষ্কার, চিন্তাভাবনা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং অধিকার চেতনা ভারত ভূখণ্ডের নিপীড়িত জনমানসে একাধিক বিকল্প সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে সামনে এনেছিল। যার ফলে নিপীড়িত নির্যাতিত গোষ্ঠীগুলি নিজস্ব ঐতিহাসিক আত্মপরিচয়ের আয়নার সামনে এসে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল। বলাবাহুল্য, তাঁদের এই নতুন আত্মপরিচয় ছিল হিন্দু-পরিচয় অর্থাৎ হিন্দুত্ববাদী সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের চেয়ে অধিক বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক যৌক্তিক এবং সর্বোপরি গ্রহণযোগ্য।

জ্যোতিরাও ফুলে

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত ভূখণ্ডে রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবি সচেতনভাবে উঠে আসার আগেই সমাজের নিপীড়িত শ্রেণির মধ্যে মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক চেতনা নির্মাণের মাধ্যমে মুক্তির কথা সর্বপ্রথম যিনি সামনে নিয়ে এসেছিলেন তিনি হলেন জ্যোতিরাও ফুলে বা জ্যোতিবা ফুলে। ১৮২৭ এর ১১ই এপ্রিল মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার লালগুণ গ্রামে একটি নিম্নবর্ণীয় মালি পরিবারে তিনি জন্মেছিলেন। ব্রাহ্মণ বন্ধুদের পরিবার দ্বারা অপমানিত হওয়ার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। তাঁর ঠাকুরদা এক ব্রাহ্মণ শুল্ক অফিসারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাকে হত্যা করে পুনা চলে যান।[১] ফলে নিজের জীবন থেকেই জাতপাত বিভাজনের কদর্য দিকগুলি সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন জ্যোতিরাও ফুলে। ১৮৫৭ এর মহাবিদ্রোহের পরবর্তী সময়কালে, হিন্দু-সমাজের জাতপাত-অস্পৃশ্যতা ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করে সামাজিক ন্যায়ের ধারণাকে সামনে নিয়ে আসেন তিনি। ১৮৫৫ সালে তিনি 'তৃতীয় রত্ন' নামে একটি নাটক লিখে মেহনতি মানুষ তার অজ্ঞতা ও অন্ধবিশ্বাসের কারণে কীভাবে ব্রাহ্মণবর্গের দ্বারা শোষিত ও অত্যাচারিত হচ্ছে তা তুলে ধরেন।[২] ১৮৬৯ সালে 'ব্রাহ্মণণচা কসব' বা 'ব্রাহ্মণদের পেশা' নামে একটি গীতিনাট্য এবং ১৮৭৩ সালে 'গুলামগিরি' বই প্রকাশ করে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে কঠোর আঘাত হানেন তিনি। জ্যোতিবা

ফুলের স্ত্রী সাবিত্রীবাঈ ফুলে ছিলেন তাঁর যোগ্য সহযোদ্ধা। ১৮৪৮-৫২ সাল পর্যন্ত তাঁরা দুজনে মিলে সমাজের নিপীড়িত অংশের মানুষ ও বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে পুনায় কয়েকটি স্কুল খোলেন। সমাজে জাতপাত-অস্পৃশ্যতা ব্যবস্থার অবসানের জন্য শূদ্রাতিশূদ্র বলে চিহ্নিত মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসারকে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন তাঁরা।

জ্যোতিবা ফুলের কাছে স্বাধীনতা শব্দের অর্থ শুধুই রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না। একটি স্বাধীন সমাজ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, "মানুষ(নিপীড়িত) যখন প্রকৃতই স্বাধীন হবে, তখন সে স্পষ্ট চোখে মুক্তভাবে নিজের কথা অন্য মানুষের কাছে বলতে বা লিখে প্রকাশ করতে পারবে। কিন্তু তার যদি সেই স্বাধীনতা না থাকে তাহলে সে কখনোই নিজের চিন্তাভাবনা বিনিময় করতে পারবে না। এরফলে অন্যরা লাভবান হলেও সে নিশ্চিতভাবেই বাতাসে বাষ্পের মতোই ভাসতে থাকবে।" "একজন মুক্ত মানুষ কখনোই তার অধিকার দাবি করতে সংকোচবোধ করবে না, যা ঈশ্বর প্রতিটি মানুষের জন্য দিয়েছেন। মানুষ তখনই সুখি হতে পারবে যখন সে নিজের অধিকার ভোগ করতে পারবে।" [৩]

হিন্দু সমাজে নিম্নবর্ণ-শূদ্র এবং অবর্ণ-অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত নিপীড়িত শ্রেণির মানুষের উপর উচ্চবর্ণ তথা ব্রাহ্মণ্যবাদী অংশের নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ২৪ শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ তিনি তৈরি করলেন 'সত্য শোধক সমাজ'। এখানে 'সত্য শোধক' শব্দের অর্থ সত্য অনুসন্ধানী। এই সংগঠনের ঘোষিত লক্ষ্যই ছিল সমাজের উচ্চবর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের দ্বারা নির্ধারিত জাতপাত-অস্পৃশ্যতা প্রথা, সামাজিক বিধিনিষেধ ও অন্যান্য অর্থহীন প্রথাগুলিকে অস্বীকার করা এবং প্রত্যাহ্বান করা। এভাবে আন্দোলন শুরু হতেই 'সত্য শোধক সমাজ' ঈশ্বর এবং মানুষের মাঝে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা অস্বীকার করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের উপস্থিতিকেই অর্থহীন বলে ঘোষণা করলো। সমাজ রাজনীতিতে ব্রাহ্মণ্য-আধিপত্যের বিরুদ্ধে জোরালো আওয়াজ তুললেন তাঁরা। সমাজের অবহেলিত নারীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করে তাঁদের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস ও চাপিয়ে দেওয়া রীতিনীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার সাহস ও আশার সঞ্চার করলেন ফুলে দম্পতি।

জ্যোতিবা ফুলে প্রকাশ্যেই হিন্দু শ্রুতিশাস্ত্র বেদকে কোনোরকম পবিত্রগ্রন্থ বলে মানতে অস্বীকার করলেন। তিনি 'সত্য' বলতে যে ধারণা সামনে আনলেন, তার ভিত্তি ছিল, প্রতিটি মানুষের আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতা। মানুষে মানুষে ভাতৃত্ববোধ, এবং সমানাধিকার বিশিষ্ট একটি এমন সমাজের কথা তুলে ধরলেন যেখানে আধিপত্যকামীর নিপীড়নের বদলে মানবমূল্যের ধারণাকে সমাজ সংস্কারের পথ হিসেবে দেখা হবে। সমাজে প্রচলিত মূর্তিপূজাকে ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণের হাতিয়ার বলে চিহ্নিত করে সকল মানুষকেই ঈশ্বরের সন্তান বলে তুলে ধরলেন তিনি। তিনি বললেন, 'ঈশ্বর হলেন সমস্তকিছুর সৃষ্টিকর্তা, পরিচালক ও রক্ষাকর্তা। তাঁর মধ্যেই রয়েছে সামগ্রিক পবিত্রতা। কিন্তু মনু এবং তাঁর বর্গের লোকেরা ঈশ্বরের ধারণাকে কলুষিত করে মানুষের উপর অনৈতিক, অমানবিক, ন্যায়হীন নিয়মনীতি লাগু করেছে। মনু এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা ঈশ্বর সংক্রান্ত যে ধারণার জন্ম দিয়েছেন, তা সমাজের একাংশের মানুষকে শূদ্র ও অতিশূদ্র বলে চিহ্নিত করে অমানুষ বলে প্রতিপন্ন করেছে এবং

সমস্ত দিক দিয়ে শোষণ চালিয়েছে তারা।'[৪]

এভাবেই হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক উচ্চ-নীচ স্তরবিন্যাসকে অস্বীকার করলেন জ্যোতিবা ফুলে। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র পুরাণ মনুস্মৃতি ইত্যাদি যে জাতপাত-অস্পৃশ্যতাকে প্রতিষ্ঠা করে, এই কথা সভা-সমিতি ও লেখালিখির মাধ্যমে অত্যন্ত জোর দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন তিনি। ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত 'গুলামগিরি' বা দাসত্ব গ্রন্থে তিনি সমাজে ব্রাহ্মণ শাসনে কীভাবে শূদ্রদের দাস বানানো হয়েছে এবং তার ঐতিহাসিক কারণ বিষয়ে নিজের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হাজির করেন। হিন্দু ধর্মীয় জাতপাত প্রথাকে এই গ্রন্থে তিনি আমেরিকার ক্রীতদাস প্রথার সঙ্গে তুলনা করেন।[৫]

১৮৭০ সালের পর জ্যোতিবা ফুলে ও সাবিত্রীবাঈ ফুলের সংস্কারধর্মী কাজকর্মের পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, হিন্দু-উদারবাদী নেতৃত্বের দ্বারা সামাজিক সংস্কারের আপোষকামী পথকে তাঁরা যুক্তিপূর্ণভাবে ভুল বলে তার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। হিন্দু উদারবাদীরা জাতপাতের অবসান চাইতেন না, কিন্তু একাংশের নিম্নবর্ণীয় কিছু সুযোগ-সুবিধা পান এটা তাঁরা চাইতেন। আসলে এভাবে তাঁরা নিম্নবর্গের মানুষের খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরণ প্রক্রিয়াকে আটকাতে চাইতেন এবং জাতপাত প্রথার কদর্য ফলাফলগুলিকে গোপন করতে চাইতেন। ফুলে দম্পতি চাইলেন আগে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু-ধর্মের জাতপাত কাঠামোর সম্পূর্ণ অবসান, যা জন্মগতভাবে মানুষকে হীন প্রতিপন্ন করে। সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্ণের রীতিনীতি ও প্রথাগুলিকে অনুকরণ করলেই নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্যদের মুক্তি ঘটবে এই পদ্ধতি তাঁর কাছে সঠিক ছিল না। তাই ব্রাহ্মণ্যবাদী-হিন্দুধর্মের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বিকল্প গল্প, লোককথা, ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করেছিলেন। সমাজে তিনি ব্রাহ্মণ ও শূদ্র -অতিশূদ্র এই দুই ধরনের মানুষের সন্ধান পেয়েছিলেন।

হিন্দু সমাজের শূদ্রাতিশূদ্র বলে চিহ্নিত গোষ্ঠীগুলিকে তিনি ভূমিপুত্র বলে মনে করতেন। অন্যদিকে আর্য বা ব্রাহ্মণদের তিনি ইরান থেকে আসা মানবগোষ্ঠী বলে মনে করতেন। জ্যোতিবা ফুলের মতে, 'শূদ্র' শব্দটি হল আর্য কর্তৃক ব্যাবহৃত ক্ষুদ্র শব্দের বিকৃত রূপ। তিনি তাঁর শূদ্রাতিশূদ্র ধারণার মধ্যে সমস্ত অব্রাহ্মণ অংশের মানুষকে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন। পশ্চিম ভারতের মারাঠা কুনবিরা হল স্পৃশ্য শূদ্র ও মাহার মং-রা অস্পৃশ্য শূদ্র। আর এই শূদ্রাতিশূদ্রদের প্রধান শত্রু হল ব্রাহ্মণ্যবাদ— এই ছিল তাঁর মতামত।

জ্যোতিরাও ফুলে ছিলেন ব্রিটিশ-আমেরিকান দার্শনিক ও রাজনীতি-তাত্ত্বিক থমাস পেইন (THOMAS PAINE, ১৭৩৭-১৮০৯) এর মানবাধিকার, বাস্তববাদ ও কার্যকারণবাদ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত। ১৮৪৮ সালে জ্যোতিরাও ফুলে, থমাস পেইনের এর লেখা 'রাইটস্ অফ ম্যান' পড়ে গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং সামাজিক ন্যায়ের ধারণা সম্পর্কে অবগত হন।[৬] থমাস পেইনের ভাবনা ১৭৭৫ এর আমেরিকান বিপ্লবে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই জ্যোতিরাও ফুলে তাঁর চিন্তাভাবনা ও সমাজ-রাজনৈতিক কাজকর্মের মধ্যে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে এক মানবতাবাদী সিদ্ধান্তকে সামনে আনলেন এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্ববাদ ও তার সামাজিক সাংস্কৃতিক ভাবনার সম্পূর্ণ বিনির্মাণ করতে চাইলেন। এবং সঙ্গেসঙ্গে একটি মানবতাবাদী সমাজের পুনর্নির্মাণকে নিপীড়িত

শ্রেণির লক্ষ্য বলে স্থির করে দিলেন তিনি। এইরকম একটি মতাদর্শে দাঁড়িয়েই তিনি এবং সাবিত্রীবাঈ ফুলে তথাকথিত নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য অংশের মানুষের মধ্যে একটি সমানাধিকার বিশিষ্ট সমাজের চিন্তা এবং আত্মমর্যাদাবোধ অর্জনের শিক্ষাকে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দের দ্বিতীয় পর্বের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, সেইসময় একমাত্র জ্যোতিরাও ফুলে এবং সাবিত্রীবাঈ ফুলে'ই সমাজের উপরমহলের সুবিধার জন্য তৈরি হওয়া জাতপাতগত বৈষম্য সমাজজীবনে কি কদর্য রূপ ধারণ করেছে, বিশ্ববাসীর সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরলেন জ্যোতিবা ফুলে। নিপীড়িত শ্রেণির লাঞ্ছনা অপমান এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধ প্রশ্ন করলেন সরকারকে। ঠিক এই কারণেই নিপীড়িত শ্রেণির কাছে আজও তিনি 'মহাত্মা' ফুলে বলে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

১৮৮৩ সালে কৃষকদের দুর্দশা বিষয়ে তিনি লেখেন, 'শ্রেতকার্যচা আসুদা' বা কৃষকের চাবুক নামে একটি তথ্যানুসন্ধান মূলক প্রবন্ধ সংকলন। একদিকে উচ্চবর্ণীয় মহাজনদের কাছে ঋণ নিয়ে দরিদ্র কৃষকরা কীভাবে সর্বস্বান্ত হচ্ছে এবং অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকার কীভাবে বিলাসব্যসনে ডুবে রয়েছে, এটাই এই বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য। ১৮৮৫ সালে ফুলে কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও তার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে একটি প্রচার পত্র 'ইশারা' প্রকাশ করেন। সেচের ব্যবস্থা, মহাজনদের দ্বারা জমি নিয়ে নেওয়া, করের বোঝা, মহাজনী ঋণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে তিনি কৃষকদের সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান। এভাবে কৃষকদের মধ্যে তিনিই প্রথম রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তুলেছিলেন এবং তাঁদের সংগঠিত করেছিলেন। জ্যোতিবা ফুলে জাতীয় কংগ্রেসের কাজকর্মের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন নিপীড়িত শ্রেণি ও কৃষকসমাজের সমস্যার সমাধান কংগ্রেস যে মতাদর্শে বিশ্বাসী তা দিয়ে সম্ভব নয়। রাষ্ট্র বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনায় সমানাধিকার ভিত্তিক স্বাধীনতার ধারণার বেশ কিছু উপাদান লক্ষ্য করা যায়। ২৮ নভেম্বর ১৮৯০ সালে জ্যোতিরাও ফুলে এবং ১৮৯৭ সালে তাঁর স্ত্রী ও সহযোদ্ধা সাবিত্রীবাঈ ফুলের মৃত্যুর পর 'সত্য শোধক আন্দোলন' স্তিমিত হয়ে পড়ে। পরে বিংশশতাব্দের দ্বিতীয় দশক থেকে এই আন্দোলন আবারও কিছুদিন শাহু মহারাজের নেতৃত্বে চলেছিল। কিন্তু শাহু মহারাজ জ্যোতিবা ফুলের নাম ব্যাবহার করে, তাঁর চিন্তাভাবনা থেকে সরে গিয়েছিলেন।

আয়োদি থাস

ব্রিটিশশক্তি ভারত ভূখণ্ডের শাসন ক্ষমতা দখল করার পর ১৮৭০ সাল নাগাদ ব্রিটেন থেকে বিপুল সংখ্যায় ইংরেজ বিনিয়োগকারী দক্ষিণ ভারতে আসতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ সরকার দক্ষিণ ভারতের শাসনকার্য মসৃণভাবে পরিচালনা করার জন্য এবং কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ, কাঁচামাল সংগ্রহ ও আধুনিক শিল্প স্থাপন করে আরো মুনাফার উদ্দেশ্যে রাস্তাঘাট, ব্রিজ, রেল যোগাযোগ স্থাপন, পোস্টবিভাগ, টেলিগ্রাফ, ব্যাঙ্ক তৈরি, এবং পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সম্প্রসারণ ইত্যাদি কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিল। দক্ষিণ ভারতে আসা ইংরেজরা এসময় নির্দিষ্ট এলাকায় কলোনি করে একসাথে পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন। এই সকল

ইংরেজ পরিবারগুলির প্রয়োজন ছিল বাগান মালি, ক্ষৌরকার, বাড়ির পরিচারক পরিচারিকা, রান্নার জন্য রাঁধুনি, ধোপা ও পাহারাদারের। তাঁদের প্রয়োজন ছিল ঘোড়ার পরিচর্যা করার লোক ও ঘোড়ার গাড়ি টানা সহিসের। এই সমস্ত পদগুলিই ছিল কায়িক শ্রমের। ফলে ব্রাহ্মণসহ উচ্চবর্ণীয়রা নিজেদের এইসকল কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এর আরেকটা কারণ ছিল ইংরেজরা গোমাংস খেতো, তাই উচ্চবর্ণীয়রা তাদের বাড়িতে কাজ করতে ঘৃণা বোধ করত। স্বাভাবিকভাবেই সেইসময় তামিলনাড়ুর নিম্নবর্ণ-অস্পৃশ্য অংশের মানুষজন, যারা এতদিন পর্যন্ত সমাজে কায়িক শ্রমের কাজ করতেন এবং নিপীড়নের স্বীকার হতেন তাঁরাই ইংরেজদের বাড়ি, বাগান, কৃষি, শিল্প, পরিবহন, সাফাই ইত্যাদি কাজগুলিতে যুক্ত হয়েছিলেন।

মাদ্রাজ শহর সংলগ্ন যেসকল বস্তিগুলি ছিল এই সময় শহরের আশপাশের লোকেরা এসে জড়ো হওয়ায় সেগুলির দ্রুত সম্প্রসারণ হয়েছিল। তারা যুক্ত হয়েছিল রেললাইন পাতার, ভারী মাল বহন ও পোস্ট অফিসের পত্রবাহকের কাজে। অনেকে যুক্ত হয়েছিল বিল্ডিং নির্মাণ, ব্রিজ রাস্তা ইত্যাদি নির্মাণের কাজে। এছাড়া পৌরসভার শহর সাফাইয়ের কাজে, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বাড়ির কাজেও অনেকে যুক্ত হয়েছিল। ব্যাবসার বিস্তার হওয়ায় সেখানেও অনেকে কাজ পেয়েছিলেন। এর ফলে নিম্নবর্গের মানুষের বৃহৎ বসতি তৈরি হয়েছিল ইগমোর, চেৎপুট, তেয়নাম্পেত, আলথত্তাম ইত্যাদি অঞ্চলগুলিতে।

এই বসতিগুলিতে কিছু সংখ্যক স্কুল, খেলাধুলার সংঘ ইত্যাদি গড়ে ওঠায় নিপীড়িত শ্রেণির একাংশের লোক নিজেদের সঙ্গবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে কিছু সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। এই সমিতিগুলির কাজ ছিল নিম্নবর্ণীয়-অবর্ণীয় অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত মেহনতি মানুষের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা ও তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটানো। তারা সরকারের কাছে নিজেদের সন্তানসন্ততিদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা ও কিশোর-যুবদের কাজের ব্যবস্থা করার দাবি পেশ করেছিল। এমনকি সরকারের কাছে ভূমিহীনরা জমির দাবিও জানিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার নিজের স্বার্থেই এই সমস্ত দাবি কিছুক্ষেত্রে সরাসরি এবং কিছুক্ষেত্রে চার্চ-মিশনারির মধ্যস্ততায় পূরণ করেছিল।

১৮২০ থেকে ১৮২৭ পর্যন্ত থমাস মুনরো (Sir Thomas Munro, ১৭৬১-১৮২৭) ছিলেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির গভর্নর জেনারেল। তাঁর অধীনে থাকা হিল স্টেট কন্সট্রাকশন ডিপার্টমেন্টের প্রধান ছিলেন জর্জ হেরিংটন। এই হেরিংটনের অধীনে চাকরি করতেন সিদ্ধ-চিকিৎসক(কবিরাজ) তিরু কন্দপ্পন। কন্দপ্পন ছিলেন একজন তামিল ভাষাবিদ এবং তাঁর কাছে তালপাতায় লেখা প্রাচীন তামিল নীতিকথা-কাব্য তিরু-কুরালের (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ - ৫০০ খ্রিস্টাব্দ) একটি সংস্করণ সংরক্ষিত ছিল। হিন্দু বর্ণাশ্রমের চতুর্থ বর্ণের নীচে থাকা অবর্ণ অস্পৃশ্য পারিয়াহ সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর পুত্র কন্দসামিও ছিলেন একজন কবিরাজ। ১৮৪৫ সালের ২০ মে মাদ্রাজ শহরের থাউজেন্ড লাইট এলাকায় কন্দসামির এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তিনি তাঁর সন্তানের নাম রেখেছিলেন কথাবরায়ণ (K. Kathabarayana)।[৭] বালক কথাবরায়ণ তার স্কুলের শিক্ষক আয়োদি থাসের চিন্তাভাবনা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে

তাঁর নামটি গ্রহণ করেন। এরপর কাজের সূত্রে আয়োদি থাস বা কথাবরায়ণ সপরিবারে নীলগিরি পাহাড়ের উটোই অঞ্চলে চলে যান। উটোয়ে থাকাকালীন তিনি অদ্বৈতবাদ নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং প্রবলভাবে অদ্বৈতবাদী চিন্তাভাবনা নিয়ে ভাবিত হন। ১৮৭০ সালে তিনি নীলগিরি পাহাড়ের 'টোড' উপজাতিদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। ১৮৭৬ সালে তাদের নিয়ে 'অদ্বৈত-সভা' নামে একটি সামাজিক সংগঠন তৈরি করেন।

অন্যদিকে এইসময় এইচ এস অলকট (Henry Steel Olcott, ১৮৩২-১৯০৭), যিনি ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি, মাদ্রাজে পঞ্চমা-অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের বালক-বালিকাদের জন্য পাঁচটি স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৮২ সালে রেভারেন্ড রটিনাম (Rev. John Rathinam) সর্বনিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য অংশের তামিলদের নিয়ে 'দ্রাবিড় এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন।[৮] মাদ্রাজ সংলগ্ন অঞ্চলে নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের জন্য রটিনাম বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।[৯] ঠিক এই সময় রটিনামের সঙ্গে পরিচয় হয় আয়োদি থাসের। ১৮৮৫ সালে তিনি এবং রটিনাম 'দ্রাবিড় পান্ডিয়ান' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পনয়মকোত্তাই এর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের শিক্ষক ও টি ধর্মরাজনের নেতৃত্বে পরিচালিত 'মাদ্রাজ মহাজন সভা'র একটি মিটিং এ আয়োদি থাস তামিল নাড়ুতে বর্ণকাঠামোর বাইরে সবচেয়ে নীচে থাকা অস্পৃশ্য 'পারিয়াহ' সম্প্রদায়কে শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মন্দিরে প্রবেশাধিকার দেওয়ার দাবি তোলেন। এবং পারিয়াহ সম্প্রদায়ের বালক-বালিকাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব রাখেন। এই সভায় উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণীয়রা থাসের দুটি দাবির তুমুল সমালোচনা করেন এবং তাঁকে জবাব দেন, 'আপনারা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতেই পারেন, কিন্তু শাস্ত্রমতে শিব অথবা বিষ্ণু কেউই আপনাদের পূজ্য দেবতা নন। আপনাদের নিজস্ব দেবতা হল কারুপ্পাস্বামী এবং সুদালামদন। আপনার তাঁদের পূজা করার অধিকার নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন।'[১০] এই ঘটনা থাসকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করেছিল।

আয়োদি থাস সম্পর্কে জি অ্যালয়সিয়াস লিখেছেন, "বৌদ্ধদর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার আগেই আয়োদি থাস উত্তর তামিলনাড়ুর একজন প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বে পরিণত হয়েছিলেন।"[১১] আয়োদি থাসের অদ্বৈত-সভার উদ্দেশ্য ছিল নিপীড়িত অংশের মানুষের উন্নয়ন ঘটানো। এই সভা একদিকে যেমন খ্রিস্টান মিশনারিদের মানুষের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার বিরোধিতা করতো, তেমনই অদ্বৈতবাদী দার্শনিক মত তুলে ধরে হিন্দু ধর্মে প্রচলিত জাতপাত বিভাজন প্রথার বিরোধিতা করত। কিন্তু 'মাদ্রাজ মহাজন সভা'র ঘটনার পর আয়োদি থাসের মনে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে আর কোনো আগ্রহ ছিল না। অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি যে হিন্দু ধর্মের সংস্কারের কথা চিন্তাভাবনা করেছিলেন, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাঁর সেই ভাবনা তাঁর কাছে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

আয়োদি থাস চিন্তা করলেন হিন্দু-পরিচয়কে শুধু অস্বীকার করলেই হবে না, নিম্নবর্ণ-অস্পৃশ্য নিপীড়িত মানুষের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য চাই একটি সঠিক আত্মপরিচয়। সেইসময়ে আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্যও এটা প্রকাশ্যে এনেছিল যে, দক্ষিণ ভারতে হিন্দু ধর্ম বাইরে থেকে এসেছে। তিনি হিন্দু ধর্মকে সরাসরি আক্রমণ করে বহিরাগত আর্যদের দ্বারা

তামিলদের উপর চাপিয়ে দেওয়া ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করলেন। ১৮৮১ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম জনসমীক্ষায় তিনি সরকারের কাছে, সমাজে অস্পৃশ্য বা পঞ্চম বর্ণ বলে পরিচিত তামিলদের 'প্রকৃত তামিল' বলে উল্লেখ করার দাবি জানালেন। ১৮৮৬ সালে জনসমীক্ষার তালিকা প্রকাশিত হলে সমাজে অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত তামিলদের 'হিন্দু নয়' বলে উল্লেখ করে সরকার। এ বিষয়ে গবেষক রবিকুমার ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "থাসের বক্তব্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তথাকথিত অস্পৃশ্য অংশের মানুষ 'বর্ণ বা জাতপাতমুক্ত দ্রাবিড়' হিসেবে প্রথম সেনসাসে বিবেচিত হয়েছিলেন। যা তামিল নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য অংশের মানুষকে ক্রমোচ্চ স্তরবিশিষ্ট হিন্দু ধর্ম ও ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিল এবং নিজেদের আদিম আত্মপরিচয়কে খুঁজে নিতে সাহায্য করেছিল।"[১২] থাস প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'দ্রাবিড় পান্ডিয়ান' এক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশদের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গেসঙ্গে নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য অংশের মানুষ এটা বুঝতে পেরেছিল যে, ভারতের এলিট সম্প্রদায়গুলিই নিজেদের সুবিধা ধরে রাখার জন্য, তাদের শূদ্র-অতিশূদ্র বানিয়ে রেখেছে। ব্রিটিশ অফিসার বা কর্মকর্তারা তাদের জাতপাতগত পরিচয়কে আমল দিতো না। ব্রিটিশ নাগরিকদের এই আচরণও অস্পৃশ্য ও নিম্নবর্ণের মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই সময়ে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সভা, সংগঠন সমাজের নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত মানুষদের অধিকার ও জাতপাতগত বৈষম্য অবসানের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিল। এই সময়কালে প্রকাশিত পত্রিকাগুলি ছিল, — 'সূর্যোদয়ম' - ১৮৬৯, 'পঞ্চমা' - ১৮৭১, 'সুগিরদবসনি' - ১৮৭৭, 'দ্রাবিড়-পান্দিয়ান' (পরবর্তীকালে এই পত্রিকার নাম হয় দ্রাবিড়) - ১৮৮৫, 'দ্রাবিড়মিত্রন' - ১৮৮৫, 'অনরর-মিত্রন' - ১৮৮৬, 'মহবিকথাতুথন' - ১৮৮৮, 'পারিয়াহ' - ১৮৯৩, 'ইন্নারা অঝুক্কম' - ১৮৯৮, 'পুলোগা ব্যসন' - ১৯০০, 'দ্রাবিড় কোকিলাম' - ১৯০৭, 'তামিঝার' - ১৯০৭, এবং 'তামিল কলম' (তামিল নারী) - ১৯০৭ ইত্যাদি। এই সকল পত্রিকার বক্তব্যগুলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, এই সকল সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রপত্রিকাগুলির মূলধ্বনি ছিল, জাতপাত-অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা করা, হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম-প্রথাকে নাকচ করা, ব্রাহ্মণ্যবাদের তীব্র সমালোচনা করা এবং হিন্দু ধর্মের গুরু 'মনু'র অনুশাসনগুলিকে নিপীড়নের হাতিয়ার বলে চিহ্নিত করে সেগুলিকে অস্বীকার করা। এই সমস্ত পত্র-পত্রিকার লেখক ছিলেন, আয়োদি থাস, এ পি পেরিয়াসামি পুলাভরা, টি সি নারায়নাস্বামী পিল্লাই, টি আই সামিকান্নু পুলাভার, পন্ডিত মুণিসামি, রেত্তামালাই শ্রীনিবাসন, জন রটিনাম, মুথুবীরা পাভালার, কে স্বপ্নেশ্বরী আম্মল প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বরা। তাঁদের রচনায় ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতি ঘৃণা এতোই প্রবল ছিল যে, হিন্দু-ধর্মীয় সমাজের অন্ধবিশ্বাস ও রীতিনীতির সমস্ত দিককেই নিম্নবর্ণ-অস্পৃশ্যদের শোষণ করার কৌশল বলে বর্ণনা করে। তাঁদের ভাষা ছিল মুগুর ধোলায়ের মত ছিলেন তারা। এবং কোনরকম আপোষপন্থী মানসিকতাকে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিলেন। এভাবে তাঁরা তামিল সমাজ-সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সমাজের প্রথাগত বন্ধনগুলি ছিঁড়ে ফেলতে চায়।[১৩] এবং লেখালিখি ও সভা সমিতির মাধ্যমে হিন্দু সমাজে শূদ্র অতিশূদ্র বলে চিহ্নিত মানুষদের

সংগ্রামে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন তাঁরা।

১ ডিসেম্বর ১৮৯১ সালে আয়োদি থাস এবং জন রটিনামের (John Rathinam) নেতৃত্বে আরো সংগঠিত ভাবে পুনর্গঠিত হয় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উটোইয়ে 'দ্রাবিড় মহাজন সভা'। নিপীড়িত বর্গের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই সংগঠনের প্রথম রাজ্য সম্মেলন দশটি সিদ্ধান্ত পাশ করে। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি ছিল, — নাগরিক অধিকারের দাবি, নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য পরিবারের সন্তানদের জন্য শিক্ষার সুযোগ, নিপীড়িত অংশের মানুষের আর্থিক উন্নতি ঘটানো, ভূমিহীনদের জন্য জমি, বিভিন্ন পরিষেবা মূলক কাজে তাঁদের অগ্রাধিকার, দক্ষিণ ভারতের কারাগারগুলিতে চলতে থাকা আপত্তিজনক বিষয়গুলি দূর করা প্রভৃতি। দ্রাবিড় মহাজন সভার এই সিদ্ধান্তের প্রতিলিপি পাঠানো হয় কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব এইসমস্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এবং মেনে নিতে অস্বীকার করে। কংগ্রেসের এহেন আচরণ দেখে আয়োদি থাস জাতীয় কংগ্রেসকে 'বাঙালি ব্রাহ্মণদের দল' বলে চিহ্নিত করেন। কংগ্রেস সম্পর্কে তিনি বলেন, "যেভাবে বর্ণব্যবস্থা ১০০৮ টি জাতে মানুষকে বিভাজন করেছে, সেভাবেই কংগ্রেসও একদিন বহুভাগে বিভক্ত হবে।[১৪]

আয়োদি থাসের চিন্তাভাবনা: ১৯ জুন ১৯০৭ আয়োদি থাস 'অরু পয়সা তামিঝান' বা এক পয়সার তামিল নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে 'এক পয়সা' শব্দটি পরিহার করে পত্রিকার নাম দেওয়া হয় 'তামিঝান'। এই পত্রিকায় আর্যদের বহিরাগত জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে নিম্নবর্ণীয় ও অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত গোষ্ঠীগুলিকে একক দ্রাবিড় নৃগোষ্ঠীর অংশ বলে তুলে ধরলেন থাস। 'তামিঝানে' তিনি লিখলেন, "আজকে যারা সমাজের সবচেয়ে নীচে রয়েছে সেই পারিয়াহরাই হলেন প্রকৃত তামিল। একসময় যাঁদের ধর্ম ছিল বৌদ্ধ। আর্য-অনুপ্রবেশকারীরা উত্তর-ভারত থেকে দ্রাবিড়ভূমিতে আসার পর বৌদ্ধ ধর্মকে ধ্বংস করেছে এবং পারিয়াহদের সামাজিক অবস্থানের অবনমন ঘটিয়েছে। পারিয়াহদের প্রতিরোধের কথা ব্রাহ্মণরা জানেন, তাই তারা পারিয়াহদের স্মৃতিতে থাকা বৌদ্ধধর্মকে নিজেদের শত্রু বলে চিহ্নিত করেন এবং এই কারণেই তারা পরবর্তীতে পারিয়াহ সম্প্রদায়কে সৈন্যদলে নিয়োগ করতে ভয় পেতেন।"[১৫] এরপর থাস মন্তব্য করেন, 'স্বায়ত্তশাসন তখনই সম্ভব, যখন ব্রাহ্মণরা একজন পারিয়াহ সম্প্রদায়ের লোককে দেখলে ভয়ে পালানো বন্ধ করবেন এবং একজন পারিয়াহ ব্রাহ্মণদের দেখলে তাড়া করা বা গোবর ছোঁড়া বন্ধ করবেন। যখন পারিয়াহরা গ্রামের অভ্যন্তরে বাস করতে পারবে ও উভয়ের মধ্যে একতাবদ্ধ হয়ে বাস করা সম্ভব হবে। বৌদ্ধধর্মকে সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করা হবে।'

আয়োদি থাস পারিয়াহ শব্দের উৎপত্তির অনুসন্ধান করে বললেন, আজকের পারিয়াহরাই হল এই ভূখণ্ডের (দক্ষিণ-ভারত) স্থানীয় বাসিন্দা। যাঁদের ধর্ম ছিল দয়াশীল, যুক্তিবাদী ও সামাজিক মুক্তির চিন্তায় চালিত বৌদ্ধ-ধম্ম। এই ডিসকোর্সে পৌঁছানোর পর আয়োদি থাস সভা ও লেখালিখির মাধ্যমে নিপীড়িত তামিলদের মধ্যে আত্মপরিচয় নির্মাণের কাজ করতে লাগলেন। হিন্দুধর্মের পরিধিতে থাকা অস্পৃশ্য গোষ্ঠীগুলিকে তিনি হিন্দু পরিচয় ছেড়ে বেরিয়ে আসার কথা বললেন।[১৬] অন্যদিকে এইসময় জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব জাতির

মুক্তির কথা বলে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের বিরোধিতা করতেন। কংগ্রেসিরা হিন্দি ও 'হিন্দুত্ব'কে ভারত ভূখণ্ডের বসবাসকারী সমস্ত জাতি, জাত, নৃগোষ্ঠীর একমাত্র পরিচয় বলে প্রচার করতেন। আয়োদি থাস এই হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদকে তামিল জাতীয়তাবাদের শত্রু বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

থাস কংগ্রেসের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে বলেছিলেন, 'আমাদের পারিয়াহ পরিচয় নিয়ে আমরা অসন্তুষ্ট। পারিয়াহ এবং চণ্ডালরা যুগযুগ ধরেই নিপীড়িত শ্রেণি। 'তামিল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই তিনি ঈশ্বর, সরকার, তামিল জনগণ, সংবাদ-মাধ্যম ও বিশ্ববিবেকের কাছে আহ্বান রাখলেন, এই নিপীড়িত শ্রেণির বক্তব্য শোনার। 'তামিল' পত্রিকায় প্রকাশিত হল, সাউথ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের সমস্যার কথা। ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের মধ্যেও যে বর্ণ-ব্যবস্থা টিকে রয়েছে তাও তিনি তুলে ধরলেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির দক্ষিণে কৃষিকাজের সমস্যা, কৃষকদের দুর্দশার কথা তথ্যসহ প্রকাশিত হল এই পত্রিকায়। নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য অংশের লোকেদের মধ্যে থেকে বিধানসভার সভ্য নিয়োগের দাবি তুললো 'তামিল' পত্রিকা।[১৭] নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি সরকারের কাছে তাদের জন্য জমির বন্দোবস্ত করার আর্জি জানালেন থাস। আর্থিকভাবে সমাজের একদম নিম্নস্তরে থাকা মানুষদের কথা সরকারের কাছে পৌঁছানোর জন্য লেখলিখির পাশাপাশি সরকারি দপ্তরের সামনে ধর্ণার আয়োজন করা হল। স্কুলগুলিতে তামিল ভাষায় লেখাপড়ার কাজ যাতে আরো সহজভাবে করা যায় সেজন্য তামিল বর্ণমালায় কিছু সংস্কার করলেন আয়োদি থাস। লিপি সহজ হলে নিপীড়িত শ্রেণি থেকে উঠে আসা ছাত্রছাত্রীদের লিখতে সুবিধা এই কথা ভেবে তিনি তামিল বর্ণমালায় সংস্কার করেছিলেন।

দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধবাদের পুনরুত্থান : পারিয়াহ সম্প্রদায় থেকে উঠে আসা আয়োদি থাস জাতপাত-অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যেভাবে আক্রমণ করেছিলেন তা খুব দ্রুত নিম্নবর্ণ অবর্ণ বলে চিহ্নিত তামিল জনতাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এক্ষেত্রে আয়োদি থাসের সঙ্গে ওলকটের সাক্ষাৎকে একটি সন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা তিরস্কারের পরে তিনি পারিয়াহ সম্প্রদায়ের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে ওলকট সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন এবং তামিলদের মধ্যে কীভাবে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটানো যায়, তা নিয়ে মানবতাবাদী ওলকটের সাহায্য চান। ওলকটের সহায়তায় আয়োদি থাস কয়েকজন আন্দোলনকারীকে নিয়ে শ্রীলঙ্কা যান এবং বৌদ্ধভিক্ষু সুমঙ্গলা নায়াকের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। সেখান থেকে ফিরে এসে মাদ্রাজে তিনি শাক্য-বৌদ্ধ সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বিভিন্ন জায়গায় এমনকি কর্ণাটকেও এই সংগঠনের শাখা তৈরি হয়। নিপীড়িত নিম্নবর্গের তামিল জনগণ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং বুদ্ধের চিন্তাভাবনা প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বলা যেতে পারে, আয়োদি থাসের প্রচেষ্টায় হিন্দুধর্ম ও বর্ণাশ্রম প্রথার যাঁতাকল থেকে বেরিয়ে আসার প্রশ্নে তামিল নিম্নবর্গের আন্দোলন বৌদ্ধবাদের মধ্যেই তার ভাবনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার দার্শনিক ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিল।

এই কাজ করতে গিয়ে আয়োদি থাস বুঝেছিলেন নিপীড়িতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিহাসকে

ব্যাখ্যা করতে না পারলে তামিল জাতির যে নতুন আত্মপরিচয় তিনি নির্মাণ করতে চাইছেন সেই কাজ সফল হতে পারে না। 'ইন্দিয়ার দেশা সারিদিরাম' বা ইন্ডিয়ার ইতিহাস নামে একটি বই লিখে আর্যজাতি এবং তামিল ব্রাহ্মণদের বহিরাগত আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত করেন তিনি।[১৮]

থাসের বৌদ্ধবাদকেতামিলদের ধর্ম বেছে নেওয়ার কারণ ছিল, সেই সময়ের হিন্দু-পুনরুত্থানবাদী এবং হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদকে সামনে রেখে সমাজের এলিট অংশ যে ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক যে চেতনাকে সমগ্র ভারত ভূখণ্ডের একমাত্র আদর্শ হিসেবে প্রচার করে যাচ্ছিলেন, থাস এই প্রথাগত, অধিবিদ্যাগত ভাবনাচিন্তার পরিসরটিকে অস্বীকার করে নিপীড়িত বর্গকে তাদের বাস্তবিক জীবনের ভিত্তিতে বৌদ্ধবাদের মধ্যে একটি পৃথক আত্মপরিচয় খুঁজে দিতে চায়ছিলেন। বৌদ্ধবাদের সকল মানুষকে সমান করে দেখার দর্শনকে তিনি নিম্নবর্ণের মানুষের মুক্তির পথ হিসেবে দেখেছিলেন। আত্মপরিচয়, আত্মমর্যাদা, অন্ধবিশ্বাস ও জাতপাত প্রথা থেকে মুক্তি এবং কল্পনায় সাম্যের ধারণাই ছিল থাস পরিচালিত নিম্নবর্গের সংস্কার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্যদের মধ্যে যৌথতার চেতনা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই সময়ের তামিল বৌদ্ধদের আন্দোলনের দৃঢ় প্রচেষ্টা ছিল, একটি সঠিক পরিচয়ে সংগঠিত হওয়ার। এভাবে বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থান নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত তামিলদের নিজস্ব পরিচয় ও সংগ্রামী চেতনা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। হিন্দু ধর্মের প্রচলিত বিভাজন কেন্দ্রিক অবদমনমূলক সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, ঈশ্বর ব্যাখ্যা এবং বিধিনিষেধগত হিংসার ধ্যানধারণাকে বুদ্ধের চার সত্য এবং আটটি মার্গের চিন্তাচেতনা দ্বারা আক্রমণ করেছিলেন বৌদ্ধবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বরা। ধর্মের চেয়েও একটি ইহজাগতিক সক্রিয় দর্শন হিসেবে বৌদ্ধবাদ, সমাজের নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য অংশের নিপীড়িত মানুষের মনে স্বাধীনভাবে বাঁচার ও অধিকার অর্জনের বীজ বপন করেছিল। বাস্তবে আয়োদি থাসের এই বৌদ্ধবাদী আন্দোলনের ফলে বৌদ্ধধর্মের প্রসার কিছুমাত্রায় ঘটলেও, আসলে বৌদ্ধ-চিন্তাপ্রস্থানের প্রসারের মাধ্যমে তিনি প্রকৃত তামিল পরিচয়ের পুনস্থাপন ঘটানোর কাজটিই করতে চেয়েছিলেন।

বৌদ্ধধর্মকে আয়োদি থাস দেখেছিলেন নিপীড়িত তামিলদের ধর্ম হিসেবে। আত্মা (Soul) ও ঈশ্বর (God) সম্বন্ধিত হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যাখ্যাটিকে প্রত্যাহ্বান করে তিনি বলেছিলেন, "ঈশ্বর হলেন সেই সমস্ত নারী-পুরুষ যাঁরা নিজেদের নৈতিক গুণাবলী দ্বারা মানবসমাজকে পরিচালনা করেন। তাঁরাই একদিন ইতিহাসে স্থান করে নেন। পরবর্তীকালে তাঁরাই উত্তরপ্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ হয়ে ওঠেন। ঈশ্বর হল মানুষের সামনে থাকা একটি আদর্শ, যার মধ্যে থাকা সৎ গুণাবলিকে অনুকরণ করে মানুষ পবিত্র নৈতিক জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। বিভিন্ন ধর্মের ঈশ্বরের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা বা ভক্তির জন্ম কোনোপ্রকার ভয়ভীতি থেকে হয়নি, অথবা কারো পক্ষে বা বিপক্ষে দাঁড়াবার জন্যও হয়নি। বুদ্ধ আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, একটি ন্যায়পূর্ণ, নৈতিকতাসম্পন্ন জীবন যাপনই ধম্ম (ধর্ম)। বুদ্ধের তিনটি মৌলিক শিক্ষা হল, — 'কম্ম ভাগাই' (পাপ কোরো না), 'অর্থ ভাগাই' (ভালো কাজ করো), 'জিনানা ভাগাই' (হৃদয় শুদ্ধ রাখো)। এছাড়াও তাঁর চতুর্থ শিক্ষাটি

হল, 'নির্বাণা ভাগাই' অর্থাৎ মুক্তি।.....বুদ্ধ 'দেবনিলাই' শব্দের ব্যাবহার করেছেন। দেবনিলাই এর অর্থ সমস্ত আদিম প্রবৃত্তি, দুষ্কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বের সকল প্রাণের সঙ্গে ভালোবাসা, সহানুভূতি ও নৈতিকতপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা। যে সমস্ত মানুষের মধ্যে এইসমস্ত গুণাবলী রয়েছে তাঁরাই দেবনিলাই বা দেবর বা দেবতা বলে গণ্য হতে পারেন। বুদ্ধ হলেন আদি দেব এবং আদি নাথ।"[১৯]

তিনি বললেন, 'ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম একটি হায়রার্কিক্যাল সমাজ ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে। যার ভিত্তি হল জাতপাত-বিভাজন ব্যবস্থা। এই ধর্ম ব্রাহ্মণদের জন্মগতভাবে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছে। এমনকি তাঁকে ঈশ্বরের সমতুল্য বলা হয়েছে। এভাবে এই ধর্ম সমাজকে উচ্চ-নীচে বিভাজন করে সাধারণ মানুষের উপর শোষণ চালিয়েছে। পাশাপাশি হিন্দু ধর্ম নারীদের নিকৃষ্ট গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করেছে।'[২০]

বিংশ শতাব্দের শুরুর দশকে বৌদ্ধবাদকে তামিল নিম্নবর্গের জনগণের সামনে এনে আয়োদি থাস তাঁদের মধ্যে আত্ম-সাম্মুখ্যবোধ (Self Assertion) এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের (Self Determination) ধারণা গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। বলা যেতে পারে থাসের পুনর্ব্যাখ্যা থেকেই সমগ্র দ্রাবিড় সমাজ নিজেদের আত্মপরিচয় (Self Identity) এবং আত্মমর্যাদা (Self Respect) খুঁজে পেয়েছিল। অবহেলিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত দ্রাবিড়রা তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনে একটি মর্যাদাসম্পন্ন সামাজিক অবস্থানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। থাস সমগ্র দ্রাবিড় জাতিসত্তার ইতিহাস নির্ভর ব্যাখ্যা হাজির করে বলেছিলেন, "স্থানীয় তামিলরা অতীতে সমান মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু পরে তাঁদের নিম্নজাত বা অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত করে বহিরাগত আর্যরা।"[২১] থাস লক্ষ্য করেছিলেন সংখ্যায় খুব সামান্য হলেও বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী তামিলরা ব্রাহ্মণদের বহিরাগত এবং দ্রাবিড় সংস্কৃতি ধ্বংসকারী বলেই মনে করেন। বলা যেতে পারে আয়োদি থাসের এই ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ থেকেই পরবর্তীকালে তামিল জাতিসত্তার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। নারীর অধিকার নিয়েও সরব হয়েছিলেন আয়োদি থাস।

আয়োদি থাস প্রসঙ্গে : আয়োদি থাস নিজের কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গেসঙ্গেই সমাজের একদম নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত অবহেলিত নিপীড়িত শ্রেণির

মানুষগুলিকে এক নতুন পরিচয় খুঁজে দিয়ে তাঁদের মধ্যে জাতিবোধের জন্ম দিতে পেরেছিলেন। যৌথতার চেতনার বিকাশের মাধ্যমেই নিপীড়িত মানুষ স্বাধীন হতে পারে এই ধারণাকে তিনি তামিলদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছিলেন। থাসের কাছে 'আত্ম' (Self) শব্দের অর্থ একক সত্তা নয় যৌথ সত্তা, যা সমানাধিকার, পরস্পর নির্ভরশীলতা, পরস্পর সম্পর্ক, ও পরস্পর প্রভাবক্ষম বিষয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থানের নিরিখে যদি দেখা হয় তাহলে দেখা যায় থাস যে স্বাধীনতার কথা বলতে

চেয়েছেন তা ছিল সামাজিক স্বাধীনতা অথবা নিপীড়িত শ্রেণির মুক্তি অর্জন। তাঁর বক্তব্য ছিল, বৌদ্ধপন্থীরাই অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের হিন্দু বলে ডাকতেন, যারা নিজেরাই পরবর্তীতে 'পারিয়াহ' বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন।

১৯১৪ সালে আয়োদি থাসের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীর ভাই ও দ্রাবিড় কাঝাগমের সহযোদ্ধা রেত্তামালাই শ্রীনিবাসন (১৮৬০-১৯৪৫) 'তামিল' পত্রিকা প্রকাশের কাজ ও সংগঠনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যান।

পি লক্ষ্মী নারাসু

আয়োদি থাসের সমসাময়িক দক্ষিণ ভারতের আরো এক চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন পোকালা লক্ষ্মী নারাসু (১৮৬০-১৯৩৪)। একদিকে তিনি ছিলেন ফিজিক্সের স্বনামধন্য অধ্যাপক এবং অন্যদিকে বৌদ্ধবাদী দার্শনিক। ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ, 'এসেন্স অব বুদ্ধিজম'। এই গ্রন্থটি সাধারণ মানুষের মধ্যে বুদ্ধের শিক্ষাকে সহজভাবে তুলে ধরার কাজে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। সেইসময় এই বইটি জাপানের নাগরিকদের কাছেও ভীষণ সমাদৃত হয় এবং পরবর্তীকালেও বহু বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯১৭ সালে পি এল নারাসু মাদ্রাজে বৌদ্ধ-সম্মেলনের আয়োজন করেন। ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়, তাঁর লেখা গ্রন্থ 'এ স্টাডি অব কাস্ট'। এই গ্রন্থে জাতপাত-অস্পৃশ্যতাকে নারাসু একটি সামাজিক ব্যাধি বলে উল্লেখ করলেন। তিনি বলতেন, যেভাবে একজন ডাক্তার এর কর্তব্য রোগীর রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা অথবা রোগের নির্মূল করা; জাতপাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও একই কাজ আমাদের করতে হবে।' জাতপাত ব্যবস্থার আলাপ-আলোচনা ও গবেষণা সংক্রান্ত প্রথম বই বলা যেতে পারে 'এ স্টাডি অব কাস্ট'কে। ভীমরাও আম্বেদকর পি লক্ষ্মী নারাসুর রচনা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

নারায়না গুরুসামী

আয়োদি থাসের সমসাময়িক অদ্বৈতবাদী আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু নারায়না গুরু বা গুরুসামী (১৮৫৬-১৯২৮) জাতপাত-অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। নারায়না গুরু ছিলেন কেরালার অস্পৃশ্য এঝাবা জাতের মানুষ এবং ধর্মগুরু। তিনি জাতপাত বিভাজন ব্যবস্থাকে অন্যায় ও ধর্মবিরোধী বলে মনে করতেন। অদ্বৈতবাদী নারায়না গুরু সমাজে সমতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে অদ্বৈতবাদের মূল শিক্ষারূপে বর্ণনা করেন। নিপীড়িত শ্রেণির মানুষের উন্নতির জন্য শিক্ষাবিস্তারের কাজে তিনি জোর দিয়েছিলেন। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে মানুষকে সরে আসতে বলতেন তিনি। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের জন্যই প্রাকৃতিকভাবে সমান বাস্তবতা বিদ্যমান। একটি পবিত্র শক্তিই সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক। তাই সমাজে একটি ধর্ম, একটি জাত এবং একটিই ঈশ্বর।' [২২] মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই। এমন কোনো কারণ নেই যা মানুষকে পরস্পর মেলামেশা

করতে, বিবাহ করতে এবং একসাথে আহার গ্রহণ করতে বাধা দিতে পারে। ঈশ্বর লাভই যদি মানুষের লক্ষ্য হয়, তাহলে কেন সে বিশ্বাসের পার্থক্যের কারণে পরস্পর লড়াই করবে।...এতগুলি ধর্মের উৎপত্তি এই কারণে হয়েছে যে, বাস্তব জীবন ও ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে করেছেন, এবং তাঁরা এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে থাকা ঐক্যের চিন্তাকে দেখতে ব্যর্থ হয়েছেন। ঈশ্বরের একত্ব, এই ধারণা অদ্বৈতবাদী দার্শনিক চিন্তা, যা একেশ্বরবাদের চেয়ে অধিক গভীর চিন্তাভাবনাকে তুলে ধরে। এই একত্বকে বোঝা জরুরি।'[২৩]। ১৯০৩ সালে নারায়না গুরুর অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় ডাক্তার পদ্মনাভন পাপলু (১৮৬৩-১৯৫০) কেরালার এঝাবা সম্প্রদায় ও অন্যান্য অস্পৃশ্য অংশের মানুষদের নিয়ে 'শ্রী নারায়না ধর্ম পরিপালন যোগম' বা SNDP তৈরি করেন। খুব শীঘ্রই এই সংগঠন দেশের সর্ববৃহৎ অস্পৃশ্য ও নিম্নবর্ণের সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৯১ সালে 'মালায়লি মেমোরিয়াল রিভল্ট' নামে পরিচিত সংস্কার আন্দোলন কেরালা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন ড. পাপলু। তাঁর নেতৃত্বে ১৮৯৬ সালে তৈরি হয় 'এঝাবা সভা'। কেরালার থানকুশরে থেকে একটি আইনি সংবাদপত্র প্রকাশ করে মালায়লি জনগণের অধিকারের কথা তুলে ধরার কাজ করেছিলেন তিনি।

শাহু মহারাজ

১৯০২ সালে মারাঠা কোলহাপুর প্রিন্সলি স্টেটের শাসক ছত্রপতি শাহু মহারাজ (১৮৭৪-১৯২২) তাঁর রাজ্যে সরকারি কাজের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ আসন অব্রাহ্মণ অংশের জন্য সংরক্ষণ করার মধ্য দিয়ে শোধক আন্দোলন পুনরায় শুরু করেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছাড়াই তিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ১৯১৩ সালের জুলাই মাসে তিনি পুনরায় 'সত্য শোধক সমাজ' সংগঠিত করে নিম্নবর্ণের মানুষকে আন্দোলনে সামিল করেন। সমাজ, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ব্রাহ্মণদের একছত্র আধিপত্যের বিরোধিতা করে পশ্চিম মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতাচ্যুত করে। ১৯২০ সালে শাহু মহারাজের নেতৃত্বাধীন শোধক-সমাজ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বলে বিরোধিতা করে। যদিও দ্বিতীয় পর্বের এই আন্দোলন ফুলের চিন্তাভাবনা থেকে সরে যায় এবং শাহু মহারাজ নিজের সম্প্রদায়কে ক্ষত্রিয় বলে স্বীকৃতি দিতে হবে এমন দাবি করে আন্দোলন শুরু করেন। এছাড়া ধীরে ধীরে নিম্নবর্ণীয় কৃষক ও ভূমিহীন অস্পৃশ্যদের হাত থেকে এই আন্দোলন অব্রাহ্মণ জমিদার ও ব্যবসায়ীদের হাতে গিয়ে পড়ে। সত্য শোধক অন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বেই এই আন্দোলন দক্ষিণ ভারতে বিস্তার লাভ করে। গড়ে ওঠে জাস্টিস পার্টি।

পেরিয়ার ই ভি রামাসামী

ই ভি রামাসামীর জন্ম হয় ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ সালে তামিলনাড়ুর এরোড শহরে। তাঁর পিতার নাম ভেঙ্কটাপ্পা নায়কর, মায়ের নাম চিন্নাতায়াম্মা। রামাসামীর পরিবার ছিল বৈষ্ণব

হিন্দু পরিবার। তাঁরা ছিলেন কর্ণাটকের বালিজা-নায়ডু সম্প্রদায়ের মানুষ। বর্ণ-কাঠামোয় অবস্থান 'শূদ্র'। মাত্র ১২ বছর বয়সে স্কুলের পড়াশোনা ছেড়ে পারিবারিক ব্যাবসার কাজে লেগে পড়েন রামাসামী। ১৯ বছর বয়সে ১৩ বছরের কিশোরী নাগাম্মলের সঙ্গে বিবাহ হয় রামাসামীর। ১৯০৩ সালে ই ভি রামাসামী বাড়ি ছেড়ে কাশির উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং ভিক্ষাবৃত্তি করে তপস্বীর মতো কিছুমাস জীবন অতিবাহিত করেন। কাশিতে তিনি জাতপাত বৈষম্যজনিত হেনস্তার স্বীকার হন এবং এই কাশির হেনস্তা তাঁকে তীব্র ধর্মবিরোধী যুক্তিবাদী মানষে পরিণত করে। এরোডে ফিরে তিনি পুনরায় ব্যবসার কাজে লেগে পড়েন এবং খুব অল্পসময়ের মধ্যেই এরোড শহরের এক প্রতিষ্ঠিত ধনী ব্যবসায়িতে পরিণত হন। পরবর্তীকালে তিনি এরোজ পৌরসভার চেয়ারম্যান, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মতো ২৯টি সাম্মানিক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

১৯১৫ সালে দ্রাবিড় অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সি শঙ্করণের লেখা 'অব্রাহ্মণের চিঠি' নামে একটি বই প্রকাশ করা হয়। এই বইয়ের প্রকাশক ছিলেন 'দ্য হিন্দু' সংবাদপত্রের প্রাক্তন সাংবাদিক করুণাকরণ মেনন। ১৯১৬ সালের ২০ নভেম্বর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে অব্রাহ্মণ তামিল নেতারা 'সাউথ ইন্ডিয়ান লিবারাল ফেডারেশন (SILF) বা 'জাস্টিস পার্টি' (এই সংগঠনের দৈনিক পত্রিকার নাম ছিল 'জাস্টিস', সেখান থেকেই এই দলকে জাস্টিস পার্টি নামে ডাকা হত) গঠন করেন। অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের নেতা এম সি রাজাহ (১৮৮৩-১৯৪৩) ছিলেন SILF-এর প্রতিষ্ঠাতা। SILF গঠনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ই ভি রামাসামী।[২৪] ১৯১৬ সালের ২০ ডিসেম্বর এসআইএলএফ বা জাস্টিস পার্টি 'অব্রাহ্মণদের ইস্তেহার' নামে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে। এই ঘোষণাপত্রটিকেই দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় নিম্নবর্ণীয়দের সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকারের দাবিতে আন্দোলনের সূচনাবিন্দু হিসেবে ধরা হয়।

১৯১৭ সালে 'মন্টাগু-চেমসফোর্ড কমিটি' ভারতে সাংবিধানিক শাসন কাঠামোর সংস্কার করতে চায়লে বিভিন্ন অংশের ভারতীয় প্রতিনিধিদের বক্তব্য জানতে চায়।[২৫] জাস্টিস পার্টি (SILF) এই কমিটির কাছে সরকারি চাকরি, প্রশাসন ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বৃত্তে অব্রাহ্মণদের জন্য সংরক্ষণ দাবি করে। ১৯০৯ সালে মুসলিমদের জন্য নির্বাচনী আসনে সম্প্রদায় ভিত্তিক সংরক্ষণ করেছিল ব্রিটিশ সরকার, দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় নেতারাও একইভাবে সর্বক্ষেত্রে নিম্নবর্ণীয়দের জন্য সংরক্ষণের দাবি তুলে ধরেন। ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কংগ্রেসের অব্রাহ্মণ দ্রাবিড় নেতারা 'মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি অ্যাসোসিয়েশন' তৈরি করলে, তাতে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন ই ভি রামাসামী। গুটি কেশব পিল্লাই ছিলেন এই সংগঠনের সভাপতি। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতিতে অব্রাহ্মণদের প্রতিনিধিত্বকে শক্তিশালী করা এবং অব্রাহ্মণ অংশের জন্য সংরক্ষণের দাবি আদায় করা। ১৯২০ সালে প্রথম অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে এম সি রাজাহ মাদ্রাজ বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ১৯২২ সালে রাজাহ 'পারিয়াহ' এবং 'পঞ্চমা' পদবি সরকারি নথি থেকে সরিয়ে দেওয়ার আবেদন করেন এবং তার পরিবর্তে আদি দ্রাবিড় ও আদি অন্ধ্র পদবি ব্যবহারের প্রস্তাব আনেন। এই সময় সমাজের নিম্নবর্গের জন্য সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের প্রস্তাব নিয়ে এম সি রাজাহ নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্যদের মধ্যে থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে মাদ্রাজ সরকারের

কাছে দাবি পেশ করেন। কিন্তু জাস্টিস পার্টি সরকার তাঁর দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং জাস্টিস পার্টি সরকারের পুলিশের সঙ্গে নিম্নবর্ণ-অস্পৃশ্য আন্দোলনকারীদের ব্যাপক সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। জাস্টিস পার্টির এই ভূমিকা দেখে এম সি রাজাহ জাস্টিস পার্টি (SILF) ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং পরবর্তীকালে 'All India Depressed Castes' Association গঠন করেন।[২৬]

সি রাজাগোপালাচারির অনুরোধে ১৯১৯ সালে কংগ্রেসে যুক্ত হলেন ই ভি রামাসামী। রাজাগোপালাচারির উদ্দেশ্য ছিল, ব্রাহ্মণ্য-আধিপত্য বিরোধী নিম্নবর্ণীয় তামিলদের যে আন্দোলন তখন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল, ই ভি রামাসামীকে কংগ্রেসে নিয়ে এসে সেই আন্দোলনকে পরাজিত করা। তিনি ভেবেছিলেন, রামাসামীই সেই উপযুক্ত লোক যাঁকে দলে নিয়ে এলে সহজেই তামিলদের উচ্চবর্ণ বিরোধী আন্দোলনের অভিমুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু বাস্তবে ফল হল উল্টো ই ভি রামাসামী কংগ্রেসে যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস নেতৃত্বের সামনে শর্ত হিসেবে রাখলেন যে,—'প্রথমতঃ সরকারি পদে, চাকরিতে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে অব্রাহ্মণ নিম্নবর্ণীয় অংশের সমান প্রতিনিধিত্বের যে দাবি দ্রাবিড় (ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য যে কোনো নিম্নবর্ণীয় শূদ্র ও অবর্ণ অতিশূদ্র) আন্দোলনকারীরা করছেন, তা কংগ্রেস নেতৃত্বকে মেনে নিতে হবে। আর দ্বিতীয়তঃ কংগ্রেস মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না।' প্রাথমিক পর্বে কংগ্রেস রামাসামীর দেওয়া শর্ত দুটিতে রাজি হয়ে যায়। প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি পেয়ে ই ভি রামাসামী নিম্নবর্ণীয় তামিলদের সংরক্ষণের দাবি কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটিতে পাশের জন্য রাখতে লাগলেন। দেখা গেল মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কংগ্রেসের ১৯২২-এর তিরুচিরাপল্লি সম্মেলনে, ১৯২৩ এর মাদ্রাজ সম্মেলনে, এবং ১৯২৪-এর তিরুবান্নামালাই সম্মেলনে, অব্রাহ্মণ-নিম্নবর্ণীয় ও অস্পৃশ্যদের সংরক্ষণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পাশ করিয়ে নিতে সফল হলেন ই ভি রামাসামী।[২৭]

ভাইকম সত্যাগ্রহ (১৯২৪) : ভাইকম সত্যাগ্রহ ছিল দক্ষিণ ভারতে সংঘটিত হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ্যবাদী-রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে এবং জাতপাতগত বৈষম্যের অবসানের দাবিতে নিপীড়িত তামিল জনতার মর্যাদা ও অধিকার আদায়ের প্রথম ঐতিহাসিক সংগ্রাম। ১৯২৪ সালের ৩০শে মার্চ, জাতপাত-অস্পৃশ্যতাজনিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সির ত্রাভানকোরের ভাইকমে (বর্তমান কেরালার কোট্টায়ম জেলা) শুরু হয় এই অবস্থান সত্যাগ্রহ। এই সময় কেরালার ত্রাভানকোর করদ রাজ্যের শাসক ছিলেন হিন্দু উচ্চবর্ণীয় মহারাজা মুলাম থিরুনাল। ১৮৮৪ সালের ত্রাভানকোরের মহারাজা-সরকারের একটি সার্কুলার অনুযায়ী, কেরালার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্দির সংলগ্ন রাস্তায় হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য অংশের মানুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল। যদিও ১৮৬৫ সালে ত্রাভানকোরের তৎকালীন মহারাজা জাতপাত নির্বিশেষে সকলকেই মন্দির সংলগ্ন রাস্তা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৮৮৪ সালের সার্কুলার প্রকাশের পর থেকে অস্পৃশ্য ও নিম্নবর্ণ অংশের কেউ কেরালার বিশেষ কিছু রাস্তায় প্রবেশ করতে পারত না। ভাইকমের 'শ্রী মহাদেব মন্দিরে'র চারদিক

দিয়ে যাওয়া রাস্তাগুলিও ছিল সেরকম সংরক্ষিত রাস্তা। যা দিয়ে এঝাবা সম্প্রদায় ও অন্যান্য অস্পৃশ্য নিম্নবর্ণীয়দের চলাফেরা নিষিদ্ধ করে রেখেছিল ত্রাভানকোরের ব্রাহ্মণ্যবাদী মহারাজা সরকার। শ্রী মহাদেব মন্দিরের বাইরের রাস্তায় চারদিকে বোর্ড টাঙানো ছিল, যাতে লেখা থাকতো, 'এঝাবা এবং অন্যান্য নিম্নবর্ণের (অস্পৃশ্য) মানুষদের জন্য এই রাস্তা নিষিদ্ধ'।[২৮]

এঝাবা জাতের মানুষরা ১৯০৫ সাল থেকেই সমস্ত জাত-সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য মন্দির সংলগ্ন রাস্তাগুলি খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এই সময় ত্রাভানকোর রাজ-বিধানসভায় নিম্নবর্ণের প্রতিনিধি ছিলেন, কে কে চানার, কুঞ্জু পানিকর ও কুমারণ আসান। তাঁরা ত্রাভানকোর বিধান-পরিষদ কর্তৃপক্ষের কাছে নিম্নবর্ণ এবং অবর্ণদের রাস্তা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার আবেদন জানালেও করদ-রাজার সরকার হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগের প্রশ্ন তুলে বারবার বিষয়টি এড়িয়ে যায়। এ বিষয়ে ই ভি রামাসামী লিখেছেন, ১৯১৯-১৯২০ এর মধ্যে তামিল-নাড়ুর অব্রাহ্মণ ও নিম্নবর্ণীয় আন্দোলনকারীরা জাস্টিস পার্টির নেতৃত্বে মন্দির সংলগ্ন সমস্ত রাস্তা যাতে সকল জাত-বর্ণের মানুষ ব্যবহার করতে পারে এই দাবিতে আইন চেয়ে প্রচার চালাতে থাকে। শুধু তামিলনাড়ুতেই এই দাবি সীমাবদ্ধ ছিল না, কর্ণাটক, কেরালা, অন্ধ্রতেও নিষেধাজ্ঞা লোপ করে সুনির্দিষ্ট আইন লাগু করার দাবি ওঠে[২৯] "১৯২০-২১ সালে ত্রাভানকোর বিধান পরিষদের সদস্য কুমারণ আসান পুনরায় অস্পৃশ্য অবর্ণদের মন্দির সংলগ্ন রাস্তা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার দাবি তুললে, মহারাজা সরকার নিষেধনামা লেখা বোর্ডগুলি কিছুটা সরিয়ে নিয়ে আংশিকভাবে কিছুটা রাস্তা খালি করে।

এরপরই ত্রাভানকোর বিধান পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন এসএনডিপি-এর সম্পাদক টি কে মাধবন। মাধবন, রাস্তায় প্রবেশ সংক্রান্ত কুমারণ অসানের অপমানজনক আপোষ নির্ভর সমঝোতা মেনে নিতে পারেননি। ভাইকমের এই মহাশিব মন্দির সংলগ্ন রাজপ্রাসাদেই ছিল, কেরলের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তর, আদালত, পুলিশ স্টেশন। এই সমস্ত সরকারি কার্যালয়ে কোনো নিম্নবর্ণীয় অথবা অস্পৃশ্যকে বদলি করে পাঠানো হত না। এবং স্থানীয় অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত জাতের মানুষরাও এই সমস্ত সরকারি দপ্তরে যেতে পারত না। মন্দির সংলগ্ন এই সকল রাস্তাগুলির দুই ধারে যে সমস্ত দোকান, বাজার ছিল কুলি হিসেবে কাজ করা নিম্নবর্ণ অথবা অস্পৃশ্যরা সেগুলিতে যেতে পারত না।[৩০] যদি কোনো অস্পৃশ্যকে মন্দিরের উল্টোদিকের রাস্তায় যেতে হত, তাহলে তাকে অন্যদিকের এক মাইল রাস্তা ঘুরে যেতে হত। এমনকি অসরি, বেনিয়ার ও তাঁতিদেরও মন্দির সংলগ্ন রাস্তায় প্রবেশের অনুমতি ছিল না।[৩১]

স্বাভাবিকভাবেই নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্যদের সংগঠনগুলি কয়েকশো বছর ধরে চলতে থাকা এই অন্যায়ের অবসানের জন্য চিন্তাভাবনা করছিল। ১৯২০ সালে জাতপাতগত এই বৈষম্য নিয়ে সরব হন আইনজ্ঞ এবং এঝাবা সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব টি কে মাধবন। তিনি মহাদেব মন্দিরে প্রবেশাধিকারের দাবি জানিয়ে ত্রাভানকোর বিধান পরিষদে একটি আবেদনপত্র জমা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য বিধানসভায় যাওয়ার অনুমতি তাঁর ছিল না, কারণ তিনি ছিলেন অস্পৃষ্য এঝাবা জাতের মানুষ। তাই আবেদনপত্র জমা

দেওয়ার কোনো উপায় না দেখে টি কে মাধবন ত্রাভানকোর মহারাজার প্রধানমন্ত্রী দেওয়ান বাহাদুর রাঘবাইয়ার বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁর কাছে আবেদন করেন, ভাইকমের মহাদেব মন্দিরে প্রবেশ সংক্রান্ত অবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মানুষের উপর যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তা প্রত্যাহার করা হোক। মন্ত্রী রাঘবাইয়া তাঁর এই আবেদন সরাসরি নাকচ করে দেন। তখন মাধবন কিছু নিম্নবর্ণীয় প্রতিনিধি নিয়ে মহারাজার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চায়লে দেওয়ান বাহাদুর তাতেও গররাজি হন। মাধবন তখন তাঁর কাছে জানতে চায়লেন, "আমাদের সমস্যার কথা বিধান পরিষদে জানাতে দেওয়া হচ্ছে না, যা আমাদের অধিকার, এমনকি আমাদের কোনো প্রতিনিধিকেও মহারাজার কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। তাহলে আমরা কীভাবে আমাদের সমস্যার সমাধান করবো? তাহলে কি আমরা ত্রাভানকোর ছেড়ে চলে যাবো?" মন্ত্রী দেওয়ান রাঘবাইয়া তাঁকে উত্তর দিলেন, "তোমাদের সমস্যার সমাধান করতে তোমরা ত্রাভানকোর ছেড়ে চলে যেতেই পারো।"[৩২]

এই ঘটনার পর ক্ষুব্ধ মাধবন, ত্রাভানকোরের বিশিষ্ট গবেষক কে এম পানিক্করের (১৮৯৫-১৯৬৩) সঙ্গে মন্দির সংলগ্ন রাস্তায় প্রবেশ নিয়ে আলোচনা করেন। পানিক্কর তাঁকে বলে "নারায়না গুরুর নেতৃত্বে যে এঝাবা সম্প্রদায়ের সংগঠন রয়েছে তা ইতিমধ্যেই একতাবদ্ধ, এবং আর্থিক-সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে তাঁরা একটি শক্তি হিসেবে কেরালায় আত্মপ্রকাশ করেছে। SNDP এখন নিপীড়িত শ্রেণির মানুষের কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়েছে। তাই শুধুমাত্র রাস্তায় প্রবেশের আন্দোলনে সীমাবদ্ধ না থেকে ভাইকমে এক এমন আন্দোলনের জন্ম দেওয়া হোক, যাতে ব্যাপক অংশের মানুষ জাতপাতগত এই অন্যায়, নিপীড়নের কথা জানতে পারে। সারা বিশ্বের মানুষের সমর্থন আদায়ের জন্য এবং এই আন্দোলনের বার্তা জাতীয়স্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই আন্দোলনকে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্তভাবেই পরিচালনা করা উচিত।"[৩৩]

পানিক্করের পরামর্শ মতো মন্দির প্রবেশ সংক্রান্ত ইস্যু নিয়ে টি কে মাধবন এম কে গান্ধির সঙ্গে দেখা করলে গান্ধি তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। ১৯২৩ সালে কেরালা কংগ্রেসের কাকিনাড়া অধিবেশনে মাধবন জাতীয় কংগ্রেসের কাছে 'অস্পৃশ্যতা নির্মূলীকরণের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক একটি আবেদনপত্র জমা দেন। কেরালা কংগ্রেস তাঁর এই দাবির সঙ্গে একমত হয়, এবং ভাইকম সত্যাগ্রহের পক্ষে থাকার প্রতিশ্রুতি দেয়। ২৪শে জানুয়ারি ১৯২৪ কেরালা-কংগ্রেসের নেতৃত্ববর্গ এরনাকুলামে সমবেত হয়ে ভাইকম আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য Untouchability Abolition Committee (UAC) তৈরি করে। এই কমিটি ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪ ভাইকমে এক বিরাট জনসমাবেশ আয়োজন করার এবং মিছিল করে গিয়ে নিষেধাজ্ঞা লেখা বোর্ড উপড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারি ভাইকমে জনসমাবেশ শুরু হতেই ব্রাহ্মণরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এই সময় ত্রাভানকোর সরকারের ম্যাজিস্ট্রেট এবং তহসীলদার এসে আন্দোলনকারী কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং ইউএসি নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করেন এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারে এমন আশংকা করে আন্দোলনকারী নেতৃত্বকে তাঁদের কর্মসূচি পিছিয়ে নিতে বলে একমাস সময় চেয়ে নেন। সরকারের অনুরোধ মতো আন্দোলনকারীরা একমাস আন্দোলন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত

নেন।

কংগ্রেস এবং ইউএসি নেতৃত্ব ঠিক করেন ৩০ মার্চ, ১৯২৪ পরবর্তী জনসভা করা হবে। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন একটি মিছিল করে নিষিদ্ধ রাস্তার কাছে যাওয়া হবে এবং সেখান থেকে তিনজন নির্বাচিত প্রতিনিধি নিষিদ্ধ রাস্তায় প্রবেশের চেষ্টা করবেন। সমস্ত বর্ণ ও অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মহাশিব মন্দিরের দক্ষিণদিকে সত্যাগ্রহের মঞ্চ তৈরি করা হয়। আন্দোলনের নেতৃত্ব হিসেবে এগিয়ে আসেন 'অস্পৃশ্যতা নির্মূলীকরণ কমিটি'র টি কে মাধবন, কে কেলাপ্পন, এবং কেশব মেনন। এভাবে ভাইকম সত্যাগ্রহ নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য মানুষের নাগরিক অধিকারের প্রশ্নটিকে ভারতীয় রাজনীতিতে সামনে নিয়ে আসে।[৩৪]

৩০ মার্চ আন্দোলনকারী স্বেচ্ছাসেবকদের একটি দল বিউগল বেজে ওঠার সঙ্গেসঙ্গেই সত্যাগ্রহ শুরু করেন। তিনজন সত্যাগ্রহী কুঞ্জাপ্পি (অতিশূদ্র পলয়ন সম্প্রদায়), বাহুলেয়ান (অস্পৃশ্য এঝাবা সম্প্রদায়) ও ভেন্নিয়ল গোবিন্দ পানিক্কর (ক্ষত্রিয় নায়ার সম্প্রদায়) মন্দিরের নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকা রাস্তায় প্রবেশ করবেন বলে ঠিক হয়। মন্দিরের দক্ষিণপ্রান্তে তৈরি হওয়া একটি আশ্রম থেকে এই আন্দোলন পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উক্ত তিনজনকে কোনোরকমভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে নিষেধ করা হয় এবং যে কোনোরকমের সরকারি অথবা উচ্চবর্ণীয়দের প্ররোচণাসৃষ্টিকারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে শান্ত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা সত্যাগ্রহীরা খাদির পোশাক, গান্ধি-টুপি ও ফুলের মালা পরে, কংগ্রেসের পতাকা হাতে নিয়ে নিষিদ্ধ রাস্তার দিকে এগোতে থাকেন। প্রতিবাদী সত্যাগ্রহীরা স্লোগান দিচ্ছিলেন, "সত্যাগ্রহের জয় হোক, মহাত্মা গান্ধির জয় হোক।" কিছুদূর এগোনোর পরই 'নিষেধাজ্ঞা নির্দেশক বোর্ডের' পঞ্চাশ ফুট দূরেই শতাধিক লাঠিধারী পুলিশ মিছিলের পথ আটকায়। যে তিনজন সত্যাগ্রহী পুলিশের বেষ্টনী ভেঙে নিষেধাজ্ঞা নির্দেশক বোর্ডের কাছে যাবে বলে ঠিক হয়েছিল তাঁরা এগোতে চেষ্টা করে। পুলিশ তাঁদের আটকায় এবং তাঁদের জাত পরিচয় জিজ্ঞেস করে। পুলিশ ওই তিন সত্যাগ্রহীকে জানায় নীচু বর্ণের(অস্পৃশ্য) লোকেরা এই রাস্তায় প্রবেশ করতে পারবে না, একমাত্র সবর্ণদেরই সেই অধিকার আছে। পুলিশের এই বক্তব্যের উত্তরে উচ্চবর্ণীয় গোবিন্দ নায়ার জানান তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিয়েই নিষিদ্ধ রাস্তায় প্রবেশ করবেন। পুলিশ তখন তাঁদের রাস্তাতেই আটকে দেয়। তিনজন সত্যাগ্রহী এই সময় ধৈর্য সহকারে সেখানে অপেক্ষা করতে থাকেন এবং পুলিশকে নিষেধাজ্ঞা বোর্ড অতিক্রম করার কাজে সহযোগিতা করার আবেদন করেন।

এইভাবে কয়েক ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পর দুপুরের দিকে ওই তিন সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তারপর তাঁদের কোর্টে তোলা হলে, বিচারক তাঁদের আর্থিক জরিমানা করেন এবং কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। সত্যাগ্রহীরা জরিমানার অর্থ দিতে অসম্মত হওয়ায় তাঁদের সাজার মেয়াদ বাড়িয়ে দেন বিচারক। এই গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে সেদিন সন্ধ্যায় মিছিল ও জনসভার আয়োজন করা হয়। ভাইকম সংলগ্ন অঞ্চলের ব্যাপক অংশের মানুষ এই সমাবেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামিল হতে থাকেন। আন্দোলনের নেতৃত্বের বক্তব্য শুনে রাত্রে তাঁরা বাড়ি ফিরে যান এবং প্রবল উৎসাহে পরদিন সকালবেলা হাজির হন। ভাইকম

সত্যাগ্রহ এভাবে কিছুদিন চলার পর ৫-৬ এপ্রিল সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা হয়। স্থগিত করার কারণ ছিল, কংগ্রেস নেতৃত্ব এইসময় হিন্দু সবর্ণ নেতৃত্বের সঙ্গে আপোষের মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করবেন বলে আলোচনা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু এই আলোচনা ব্যর্থ হয়। এবং সত্যাগ্রহ পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। ৭ এপ্রিল অস্পৃশ্যতা নির্মূলীকরণ কমিটির নেতা টি কে মাধবন এবং কেরালা কংগ্রেসের সভাপতি কে পি কেশব মেননকে গ্রেপ্তার করে মহারাজা সরকারের পুলিশ। কিন্তু ১০ এপ্রিল পর্যন্ত আন্দোলন একইভাবে চলতে থাকে। মন্দিরের চারপাশের নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্যদের জন্য নিষিদ্ধ রাস্তা ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলে পুলিশ। রাস্তাগুলিতে সত্যাগ্রহীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। ত্রাভানকোর পুলিশ সিদ্ধান্ত নেয় কোনো সত্যাগ্রহীকে আর গ্রেপ্তার করা হবে না। সত্যাগ্রহীরা তখন অনশন আন্দোলনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যদিও এম কে গান্ধি সত্যাগ্রহীদের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বিবৃতি দেন এবং অনশনকে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মূলনীতির বিরুদ্ধে বলে মন্তব্য করেন।

ইতিমধ্যে এই ধরনের রাস্তা ঘিরে দেওয়ার বিরুদ্ধে ব্যাপক অংশের মানুষ আন্দোলনে সামিল হতে শুরু করে। আন্দোলনের সমস্ত নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার করার পরেও আন্দোলনের অগ্রগতি দেখে পুলিশ গ্রেপ্তার না করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে এবং আন্দোলনকে দমন করার কৌশল গ্রহণ করে। হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণীয় রক্ষণশীল অংশ পুলিশের পক্ষে দাঁড়িয়ে আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণ করে। এই ঘটনায় ত্রাভানকোরের মন্ত্রী দেওয়ান রাঘবাইয়া বিধানসভায় প্রাচীন সামাজিক প্রথা রক্ষা করার কথা বলে সত্যাগ্রহীদের তির্যকভাষায় সমালোচনা করেন। উচ্চবর্ণীয় রক্ষণশীলরা এই সময় গান্ধির কাছে শতাধিক চিঠি পাঠিয়ে তাঁকে এই আন্দোলন প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানান। কেরলের দুই উচ্চবর্ণীয় সম্প্রদায়ের উকিল শিবরাম আইয়ার এবং তাঁর ভাই বঞ্চিশ্বর আইয়ার গান্ধির সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁকে জানান যে, ভাইকম শিবমন্দির ঘিরে যে রাস্তা রয়েছে, তা ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত তাই এই সত্যাগ্রহ অপ্রাসঙ্গিক।

ভারতবর্ষের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় ভাইকম সত্যাগ্রহের খবর প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন রাজ্য থেকে আন্দোলনকারীদের সমর্থন জানিয়ে আর্থিক সাহায্য আসতে থাকে। পাঞ্জাবের আকালি সংস্থার সদস্যরা ভাইকমে আসেন এবং সত্যাগ্রহীদের মধ্যে বিনামূল্যে খাবার বিতরণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। খ্রিস্টান এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধেও ভাইকম মন্দিরের পূর্বদিকের রাস্তায় যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা ছিল। স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় খ্রিস্টান এবং মুসলিমরাও আন্দোলনকারীদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। খ্রিস্টান ব্যারিস্টার জর্জ জোসেফ, অহিন্দু ভজমাতারাম মাথুন্নি এবং ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদক আবদুল রহমান সত্যাগ্রহে সামিল হতে এগিয়ে আসেন। হিন্দু ভিন্ন অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ভাইকম সত্যাগ্রহের সমর্থনে এগিয়ে আসা এম কে গান্ধির পছন্দ হয়নি। ৬ এপ্রিল গান্ধি জর্জ জোসেফের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখে জানান, "ভাইকম বিষয়ে আমি মনে করি আপনি হিন্দুদের নিজেদের কাজ তাঁদেরই করতে দেবেন। এটা হিন্দুদের নিজেদের সংগ্রাম যা তাঁদের শুদ্ধিকরণ ঘটাবে। আপনি তাঁদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে অথবা তাঁদের পক্ষে লেখালিখি করতে পারেন, কিন্তু আন্দোলন সংগঠিত করা অথবা সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করা আপনার পক্ষে

উচিত নয়। যদি আপনি কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনের সিদ্ধান্তের বিষয়ে অবগত হন তাহলে অবশ্যই এটা জানেন যে, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে শুধুমাত্র হিন্দু সদস্যদেরই উদ্যোগী হতে বলা হয়েছিল। আমি মি. অ্যানড্রুজের কাছে এটা জেনে খুব অবাক হয়েছি যে, এই রোগ সিরিয়ান খ্রিস্টানদেরও সংক্রমিত করেছে।" যদিও এই চিঠি জোসেফের কাছে পৌঁছানোর আগেই তিনি গ্রেপ্তার হয়ে যান। ২৪ এপ্রিল এবং ১ মে তারিখের ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় গান্ধি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাহায্য নেওয়া বিষয়ে লেখেন, এই আন্দোলনে "হিন্দুরা হিন্দুসমাজ বহির্ভূত কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে সাহায্য গ্রহণ করলে, তা একাংশের স্থানীয় হিন্দুদের কাছে বিরক্তি উদ্রেককারী হতে পারে। যদি সত্যাগ্রহীদের স্থানীয় হিন্দুদের প্রতি সহানুভূতি থেকে থাকে, তাহলে তাঁদের যে অর্থের প্রয়োজন তা তাঁরা স্থানীয় হিন্দুদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে পারেন।"

এমতাবস্থায় আন্দোলনের সমস্ত নেতৃত্ববর্গ গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায় আন্দোলন কিছুটা থিতিয়ে পড়েছিল। গান্ধির বিরোধিতা দেখে হিন্দু ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বী নেতৃত্ব ও সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষরা পিছু হটতে বাধ্য হন। ঠিক এইসময় আন্দোলনের হাল ধরার জন্য জেল থেকে ব্যারিস্টার জর্জ জোসেফ ও নীলাকান্ত নাম্বুদ্রি তামিলনাড়ু কংগ্রেসের সভাপতি ই ভি রামাসামীর কাছে একটি চিঠি পাঠান। ই ভি রামাসামী তখন মাদ্রাজের বাইরে ছিলেন। জোসেফ ও নাম্বুদ্রির চিঠি পেয়ে ১৩ এপ্রিল স্ত্রী নাগাম্মাকে সঙ্গে নিয়ে ভাইকমে পৌঁছান ই ভি রামাসামী। এই সময় ভাইকমে প্রকাশ্য সভা আয়োজনের অনুমতি ছিল না। ই ভি রামাসামী সরকারি নিষেধাজ্ঞার পরোয়া না করে ত্রাভানকোরের একাধিক জায়গায় প্রকাশ্য সভার ডাক দেন। আইন ভাঙার অপরাধে ভাইকম মন্দিরের সভাস্থল থেকে রামাসামীকে গ্রেপ্তার করে মহারাজা সরকারের পুলিশ। এক মাসের সাজা হয় ই ভি রামাসামীর। কেরালার আরিভিকুত্তু জেলে একমাস বন্দী থাকার পর মুক্ত হলে, রামাসামুর নামে কেরালা ছেড়ে যেতে বলে ওয়ারেন্ট জারি করে মহারাজা সরকার। কিন্তু ই ভি রামাসামী সরকারি আদেশ অগ্রাহ্য করে ফের সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ভাইকমে যান। রামাসামী ভাইকমে এসেছেন শুনে ব্যাপক অংশের মানুষ সমাবেশে হাজির হন। ই ভি রামাসামীকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে সরকার। এই মামলায় তাঁর ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ঘোষণা করে আদালত।

এই ঘটনার পর ভাইকম আন্দোলন পরিচালনার পদ্ধতিগত ত্রুটি নিয়ে নারায়না গুরু এবং গান্ধির মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধ দেখা দেয়। ভাইকম সত্যাগ্রহ নিয়ে নারায়না গুরুর মতামত ছিল, "পীড়া সহনের ক্ষমতা এবং আত্মত্যাগের ইচ্ছা অবশ্যই প্রয়োজনীয়, কিন্তু জলে ভিজে, অনাহারে দিন কাটিয়ে সত্যাগ্রহ চালানোর অর্থ কি? যেখানে প্রবেশে বাধা রয়েছে সেখানে প্রবেশ করা হোক, তারপর কী হয় তা দেখা যাক। তারা আঘাত করার আগেই আমাদের আঘাত করতে হবে। যদি আপনাদের (সত্যাগ্রহী) অগ্রসর হওয়ার পথে বাধা দেওয়া হয়, তাহলে বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যান। শুধুমাত্র রাস্তায় প্রবেশের অধিকার আদায় করেই থেমে গেলে হবে না, মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে, প্রত্যেকদিন, প্রত্যেকে।"[৩৫] নারায়না গুরুর এই মন্তব্যকে উপলক্ষ্য করে কংগ্রেসের উচ্চবর্ণীয় নেতৃত্ব এম কে গান্ধিকে ভাইকম সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করার পরামর্শ দেন। তাঁরা বলেন 'থাইয়াস' সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক

গুরু তাঁর অনুগামীদের হিংসার পথ নিতে বলছেন, যা সত্যাগ্রহ আদর্শের মূলনীতির পরিপন্থী।

নারায়না গুরু কোনোদিনই কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু ভাইকম সত্যাগ্রহ শুরু করার পিছনে তিনি এবং তাঁর সংগঠন শ্রী নারায়না ধর্মীয় পরিপালনা যোগম বা SNDPY গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। নারায়না গুরু নিম্নবর্ণীয় ও অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত মানুষদের সংগঠিত করে, তাঁদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের অধিকার বিষয়েও সচেতন করে তুলেছিলেন। এছাড়া নারায়না গুরু ও তাঁর অনুগামী মহাকবি কুমারণ আসান ভাইকম মন্দিরের রাস্তা দিয়ে রিক্সা করে যাওয়ার সময় একজন উচ্চবর্ণীয় মাতালের দ্বারা জাতপাতগত হেনস্তার স্বীকার হয়েছিলেন। ২৯মার্চ ১৯২৪ মালায়লা মনোরমা পত্রিকার সম্পাদকীয়তে এই ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে হাজির করে লেখা হয়েছিল, নারায়না গুরুর অনুগামীরা কি এই ঘটনা শুয়েশুয়ে দেখবে? যদি তাঁরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন কোন সরকারের ক্ষমতা আছে তাঁদের বলপ্রয়োগ করে রোখার? বলা যেতে পারে, সমানাধিকারের দাবিতে নারায়না গুরু যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, ভাইকম সত্যাগ্রহে তিনি তাঁর সেই লক্ষ্যের সাফল্য দেখতে পেয়েছিলেন। ভাইকম আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব টি কে মাধবন ছিলেন তাঁর বিশেষ অনুরাগভাজন।

মে মাসে ভাইকম সত্যাগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হন আশপাশের গ্রামের নিম্নবর্ণ-পরিবারের নারীরা। নারীদের বিপুল অংশগ্রহণ দেখে ২০ মে ১৯২৪ আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ই ভি নাগাম্মাকে (রামাসামীর স্ত্রী) গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার হন এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা টি কে মাধবনের স্ত্রী, জর্জ জোসেফের স্ত্রী। ১৯২৪ এর ৭ অগাস্ট মহারাজা মুলাম থিরুনালের মৃত্যু হলে তাঁর ভাইজি সেথু লক্ষ্মী বাঈ মহারানি হিসেবে রাজ-সিংহাসনে বসেন। মহারানি তাঁর রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে সমস্ত বন্দীর মুক্তি ঘোষণা করেন। অগাস্ট মাসে ই ভি রামাসামী সহ ভাইকমের সত্যাগ্রহের সমস্ত নেতৃত্ব মুক্তি পান। রামাসামী জেল থেকে বেরিয়ে পুনরায় সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে যোগ দেন এবং এই আন্দোলনের মাধ্যমে আপোষহীনভাবে মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই চালানোর কথা ঘোষণা করেন।

এরকম পরিস্থিতিতে এম কে গান্ধি ঠিক করলেন হিন্দু সবর্ণ সম্প্রদায়ের সমর্থন ভাইকম আন্দোলনের সাফল্যের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। ভাইকম আন্দোলনের নেতৃত্বের সামনে তিনি শুধুমাত্র সবর্ণদের নিয়ে একটি মিছিল করে রাজধানী ত্রিবানদ্রাম পর্যন্ত যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। গান্ধি ভেবেছিলেন, সবর্ণ হিন্দুরা অবর্ণদের প্রতি সহানুভূতি দেখালে এবং তাঁদের দাবি সমর্থন করলে সবর্ণদের প্রতি অবর্ণদের বিশ্বাস বাড়বে। নায়ার সম্প্রদায়ের নেতা মান্নাথু পদ্মনাভন এর নেতৃত্বে প্রায় ৫০০ সবর্ণ হিন্দুর মিছিল ১ নভেম্বর ১৯২৪ ভাইকম থেকে যাত্রা শুরু করে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের মধ্যদিয়ে অতিক্রম করার সময় বহু সবর্ণ সম্প্রদায়ের মানুষ এই মিছিলে যুক্ত হয়। অবশেষে ১২নভেম্বর ১৯২৪ প্রায় পাঁচ হাজার সবর্ণের মিছিল ত্রিবানদ্রামে পৌছায়। একই সময়ে প্রায় ১০০০ সবর্ণের মিছিল পেরুমল নাইডুর নেতৃত্বে ত্রিবানদ্রামে পৌছায়। সেখানে এক বিরাট জনসভা হয়। ১৩ নভেম্বর ১৯২৪ চানগণেশ্বরী পরমেশ্বরণ পিল্লাই এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল মহারানি সেথু লক্ষ্মীবাঈ এর সঙ্গে দেখা করেন এবং রাস্তা খোলার স্বপক্ষে ২৫,০০০ সবর্ণ হিন্দুর স্বাক্ষর সম্বলিত

একটি মেমোরেন্ডাম দাখিল করেন।

কিন্তু এই মেমোরেন্ডাম দাখিল করার পরেও মহারানি জানিয়ে দেন এই বিষয়ে বিধান সভাতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ ত্রাভানকোর বিধানসভায় এই মেমোরেন্ডাম, যেখানে লেখা ছিল ত্রাভানকোর রাজ্যের মন্দির সংলগ্ন সমস্ত রাস্তা সমস্ত জাত-বর্ণ ও সমস্ত ধর্মের মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হবে, ২১টি ভোট পেয়ে ১ ভোটে পরাজিত হয়। অনুমান করা হয় ড. পালপুর ভাই সরকারের অনুগ্রহ লাভের আশায় বিরোধী পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। পূর্বে তিনি ছিলেন নারায়না গুরুর একজন অনুগামী কিন্তু পরে তিনি ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই ঘটনায় তাঁকে নিম্নবর্ণীয় সম্প্রদায়ের আন্দোলনকারীরা তাকে সমাজচ্যুত করলে তিনি পালিয়ে যান।

আন্দোলকারীদের সিদ্ধান্তের পরাজয় সত্যাগ্রহীদের হতাশ করে, অন্যদিকে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের আরো হিংস্র করে তোলে। ই ভি রামাসামী এই সময় জেলে ছিলেন। ইন্দুনথুরুথি নাম্বুদিরি নামে এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ নেতার আহ্বানে বেশ কিছু জায়গায় রক্ষণশীল ব্রাহ্মণরা অবর্ণ সত্যাগ্রহীদের উপর সহিংস আক্রমণ চালায়। ভাইকমে সত্যাগ্রহীদের মারধর করে ব্রাহ্মণদের ভাড়া করা দুষ্কৃতীরা। সত্যাগ্রহী ও আন্দোলনকারীদের পুকুরের জলে ছুঁড়ে ফেলা হয়। তাঁদের চোখে কেমিক্যাল মিশানো জল ছুঁড়ে দেওয়া হয়। সত্যাগ্রহীদের উপর এই আক্রমণের বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রতিবাদ মিছিল আয়োজিত হয়। ব্রাহ্মণ পরিচালিত মন্দিরগুলি বয়কট করে তাতে অর্থ দান বন্ধ করে মাদ্রাজের অব্রাহ্মণ অংশের ব্যাবসায়ীরা। অন্যদিকে ভাইকমে আমরণ অনশন শুরু করেন সত্যাগ্রহীরা। সবর্ণ মহাজন সভা ভাইকম সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় মিটিং করতে থাকে। কেরালার বিভিন্ন জায়গায় সবর্ণ ও অবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে দাঙ্গা দেখা দেয়। সত্যাগ্রহীরা অনুভব করে এই ধরণের হিংসার বিপক্ষে নরম সত্যাগ্রহ কার্যকরী হতে পারে না। এই ঘটনার পর সারা ভারতবর্ষের মুসলিম ধর্মের নেতৃত্ব, উত্তর ও পশ্চিম ভারতের নিম্নবর্গ সমাজের আন্দোলনকারীরা, পাঞ্জাবের শিখ-সম্প্রদায় ও খ্রিষ্টান-পাদ্রিরা ভাইকম আন্দোলনের সমর্থনে মিছিল ও সভার আয়োজন করেন। মালয়েশিয়া ও অন্যান্য দেশের তামিলরাও এই আন্দোলনের সমর্থনে বিক্ষোভে সামিল হয়।

ভাইকম সত্যাগ্রহের দাবি নিয়ে মহারানি সেথু লক্ষ্মীবাঈ, গান্ধির সঙ্গে আলোচনা করেন এবং 'আন্দোলনকারীরা মন্দির প্রবেশের আন্দোলন করবেন না', এই শর্তে ২৩শে নভেম্বর ১৯২৫ মন্দিরের সংলগ্ন চারটি রাস্তার গেট অস্পৃশ্যদের চলাফেরার জন্য খুলে দেওয়া হয়। পরে ১৯২৮ সালে ত্রাভানকোরের মন্দিরের আশপাশ দিয়ে যাওয়া সমস্ত রাস্তা নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য অংশের মানুষদের ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়। এই জয়ের পর ভাইকমের সত্যাগ্রহীরা ই ভি রামাসামীকে, 'ভাইকমের বীর' উপাধিতে ভূষিত করেন।[৩৬] শেষমেশ ১৯৩৬ সালে 'ভাইকম সত্যাগ্রহ' জয়ী হয়, এবং ভারতবর্ষের সমস্ত মন্দির চত্বরে নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্যদের প্রবেশকে আইনি স্বীকৃতি দেয় সরকার।

শেরমাদেবী গুরুকুলম আন্দোলন (১৯২৫) : ১৯২২ সালে তিরুনেলভেলি জেলার শেরমাদেবীতে স্বদেশ-ভাবনা ও সমাজসেবায় উৎসাহ দিতে ব্রিটিশ ও মিশনারি স্কুলের

বিপরীতে তৈরি হয় 'তামিল গুরুকুলম' বিদ্যানিকেতন।[৩৭] তামিলনাড়ুর কংগ্রেস নেতৃত্বই ছিলেন এই স্কুল গঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এই গুরুকুল-স্কুলের প্রধান-শিক্ষক ছিলেন ভি ভি এস আইয়ার নামে এক স্বাধীনতা সংগ্রামী। ভিভিএস আইয়ার ছিলেন একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ এবং তামিলনাড়ু কংগ্রেসের সদস্য।

১৯২৫ সালের জানুয়ারিতে এই গুরুকুলে জাতপাত অস্পৃশ্যতার অভিযোগ এনে এক অব্রাহ্মণ ছাত্র তামিলনাড়ু কংগ্রেসের কাছে চিঠি পাঠায়। এই চিঠি থেকে জানা যায়, এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের জন্য পৃথক রান্না ও পৃথক আহার-কক্ষের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। অভিযোগ পেয়ে তামিলনাড়ু কংগ্রেস দ্বারা নিযুক্ত একটি তদন্তকারী দল এই ঘটনার তদন্তে গুরুকুলমে যায়। তদন্তে কংগ্রেস নেতৃত্ব জানতে পারেন, দুজন ব্রাহ্মণ ছাত্রকে তাদের পরিবারের ইচ্ছানুসারে গুরুকুলমে আলাদাভাবে খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

এই ঘটনায় তামিলনাড়ুতে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ বৈষম্য নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯২৫, 'তামিল-নাড়ু' পত্রিকা লেখে, 'এই ঘটনা প্রমাণ করছে তামিলরা (অব্রাহ্মণরা) কোনো সামাজিক ন্যায় আশা করতে পারে না, এমনকি ভি ভি এসের কাছেও।' এই সময় এম কে গান্ধি মাদ্রাজেই ছিলেন। তিনি বলেন, — 'মাত্র দুজন ছাত্রকে পৃথক আহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতে এধরনের অনুশীলন গুরুকুলের উদ্দেশ্য নয়।'

তিরু ভি কা এই ঘটনায় গুরুকুলের প্রধান ভি ভি এস আইয়ারকে নিয়ম পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করলে, তিনি বলেন, -'তিরু ভি কা তামিল-নাড়ুতে চলা নোংরা প্রচারের সমর্থন জানাচ্ছেন।' অবশেষে অব্রাহ্মণ তামিল সংগঠনগুলির আন্দোলনের চাপে, ২১শে এপ্রিল ১৯২৫ গুরুকুলমের প্রধান ভি ভি এস আইয়ারকে প্রধান-আচার্যের পদ থেকে সরিয়ে দেয় কংগ্রেস। কিন্তু এরপরে জানা যায়, গুরুকুলমের রাঁধুনি একজন ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ ছাত্রদের জন্য পৃথক খাবার তৈরি হয়।[৩৮] শিক্ষাক্ষেত্রে এইধরনের জাতপাতগত বৈষম্য অপসারণের দাবিতে শেরমাদেবী গুরুকুলমের নিম্নবর্ণের ছাত্ররা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এই ঘটনায় জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা দেখে ই ভি রামাসামী কংগ্রেসকে একটি ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু জাতীয়তাবাদের ফেরিওয়ালা দল হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৩৯]

গুরুকুলমের এই ঘটনার প্রভাব তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে ছিল মারাত্মক। শিক্ষাক্ষেত্রে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে সেজন্য, এস রামানাথন প্রস্তাব রাখেন যে, 'জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত কোনো সংগঠনই জন্মগত ভাবে মেধার বিচার করতে পারে না', তাই তিনি স্বয়ং, ই ভি রামাসামী এবং ভি ত্যাগরাজ চেত্তিকে নিয়ে একটি কমিটি তৈরি হোক যারা গুরুকুলমকে একটি সঠিক নীতি নির্ধারণ করতে সাহায্য করবে।[৪০] কংগ্রেসের সভায় এই সিদ্ধান্ত পাশ হয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের পরেই কংগ্রেসের উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণ নেতৃত্ব, ভারাদারাজুলু নাইডু (বালিজা সম্প্রদায়)কে অপমান করেন এবং তামিলনাড়ুতে জাতপাতগত অনুভবে প্ররোচণা দিয়ে জাতীয় ঐক্য ভাঙার অভিযোগ করে নিন্দা প্রস্তাব আনেন। নিন্দা প্রস্তাব বাতিল হলেও এই ঘটনার পরেই কংগ্রেস কার্যত ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পেশায় চিকিৎসক ভারাদারাজুলু নাইডু এর উত্তরে বলেন, "অব্রাহ্মণদের

জাতীয় জীবনের জন্য হয়তো গুরুকুলমই ডিসাইডিং ফ্যাক্টর হতে চলেছে, তাঁরা খুব বেশীদিন জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিম্ন-অবস্থান মেনে নেবেন না।"[৪১] ভারাদারাজুলু নাইডু আরো বলেন, "যদি আমার বিজয় হয়, তাহলে ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণ উভয়ের জন্যই তা বিজয় হবে, কিন্তু যদি আমি হেরে যাই, তাহলে তা ব্রাহ্মণদের জন্য মারাত্মক হবে।" ই ভি রামাসামী এই ঘটনায় দারুণ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'ব্রিটিশ-রাজ শেষ হওয়ার আগে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করলে ভবিষ্যতে আমাদের ব্রাহ্মণ্য স্বেচ্ছাচারিতার স্বীকার হতে হবে।'

তামিলনাড়ুর কংগ্রেস কমিটিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ই ভি রামাসামী এবং এস রামানাথন শেরমাদেবী গুরুকুলমে জাতপাতগত বিধিনিষেধ অপসারণ বিষয়ে আলোচনার জন্য যান। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল তাঁদের বক্তব্য ভি ভি এস আইয়ার এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ্যবাদী পরিচালকরা মেনে নিলেন না। অবশেষে কে জি গণপথি শাস্ত্রী নামে এক উদার ব্রাহ্মণ এবং শানমুগাম চেত্তিয়ার নামে এক কংগ্রেস সদস্যের মধ্যস্থতায় গুরুকুলম কমিটি এবং ই ভি রামাসামীর আলোচনা সম্পন্ন হয়। ঠিক এই সময় প্রধান আচার্য আইয়ার একটি দুর্ঘটনায় পড়ে মারা যান। এই ঘটনায় রামাসামী এবং ভারাদারাজুলু দুঃখ প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁরা ব্রাহ্মণ্য - আভিজাততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কংগ্রেসের কাঞ্চিপুরম অধিবেশনে গুরুকুলমকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বাদানুবাদ দেখা দেয়।

শেরমাদেবীর এই শিক্ষাকেন্দ্রটি কংগ্রেসের দেওয়া আর্থিক সহায়তায় গড়ে উঠেছিল। রামাসামী এবং তাঁর অনুগামীরা আর্থিক সহায়তাকারীদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটির হাতে গুরুকুলমের নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। গুরুকুলমের নবনিযুক্ত আচার্য তাতে রাজি না হওয়ায় অবশেষে বিতর্ক বন্ধ করতে গুরুকুলটি বন্ধ করে দেয় কংগ্রেস। শেরমাদেবী গুরুকুলম এর ঘটনার পরেই ই ভি রামাসামী রাজনৈতিক দল, চাকরি, প্রশাসনসহ সর্বক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ অব্রাহ্মণদের জন্য সংরক্ষণের দাবি জোরালোভাবে উত্থাপন করেন। বলা যেতে পারে গুরুকুলম স্কুলটি মাত্র তিন বছর চলে বন্ধ হয়ে গেলেও, গুরুকুলমের ঘটনা তামিল অব্রাহ্মণ ও নিম্নবর্ণীয়-অস্পৃশ্য অংশকে দারুণভাবে জাগিয়ে তুলেছিল। নিপীড়িত শ্রেণির আত্মাভিমানে, তামিল জাতিসত্তার অভিমানে আঘাত করেছিল শেরমাদেবী গুরুকুলমের এই জাত-জাতি বিদ্বেষী ঘটনা। ই ভি রামাসামীর কংগ্রেস ত্যাগ করার অন্যতম কারণ ছিল গুরুকুলমের এই ঘটনার অভিজ্ঞতা।

কংগ্রেস ও রামাসামী : ১৯২৩ সালে মাদ্রাজ সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে তামিলনাড়ু কংগ্রেসের প্রাদেশিক সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ই ভি রামাসামী।[৪২] নিজের চিন্তাভাবনা অনুযায়ী ১৯২৫ সালের নভেম্বরে তামিলনাড়ু কংগ্রেস কমিটির কাঞ্চিপুরম সম্মেলনে নিম্নবর্ণের জন্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রস্তাব পেশ করলেন তিনি। এই সম্মেলনে নিম্নবর্ণীয়দের সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিল পাশের বিরুদ্ধে থাকা ব্রাহ্মণ্যবাদী কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে রামাসামী ও তাঁর অনুগামীদের সংঘাত চরম আকার ধারণ করে। অবশেষে তামিলনাড়ু কংগ্রেস নিম্নবর্ণীয়দের সরকারি চাকরি ও প্রশাসনে ৫০% সংরক্ষণে রাজি না হলে, ই ভি রামাসামী তীব্র ক্ষোভ

প্রকাশ করে সম্মেলন মঞ্চে বললেন, "সভাপতি মহাশয়, আমি এই আশা ত্যাগ করছি যে, কংগ্রেস পার্টির কাছে থেকে অব্রাহ্মণরা কোনো সুবিচার পেতে পারে। তাই আমি এই মুহূর্তেই পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। এরপর থেকে আমার প্রাথমিক লক্ষ্য হবে, কংগ্রেস দলকে ধ্বংস করা, কারণ এই দল জাতপাত ও বর্ণাশ্রম প্রথাকে টিকিয়ে রাখতে চায়।"[৪৩] এই বলে ই ভি রামাসামী ও তাঁর অনুগামীরা অর্থাৎ অব্রাহ্মণ ও নিম্নবর্ণ তামিল নেতৃত্ব সম্মেলন কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। এরপরই সরাসরি বিবৃতি দিয়ে ই ভি রামাসামী কংগ্রেসকে ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্ণীদের দল বলে চিহ্নিত করে, তার তীব্র সমালোচনা করেন। এইসময় তিনি গান্ধির সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে এটা বুঝতে পারলেন যে, গান্ধি শুধুমাত্র তাঁকে ব্যাবহার করে দক্ষিণ ভারতের সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য-হিন্দুত্ববাদী চিন্তার প্রচার করতে চায়ছেন।

পরবর্তী পরিকল্পনা হিসেবে সমাজের 'নিম্নবর্ণীয়দের' সংগঠিত করে ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্ণীয় জমিদারদের নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরির কথা চিন্তা করলেন ভেঙ্কট রামাসামী। জাস্টিস পার্টি এইসময় তাঁকে দলে নেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু জাস্টিস পার্টির লক্ষ্য ও মতাদর্শের সঙ্গে একমত ছিলেন না রামাসামী। তাছাড়া এই দল ছিল অব্রাহ্মণ ধনী ব্যাবসায়ী ও জমিদারদের মদতপুষ্ট। দক্ষিণ-ভারতের বৃহৎ-জমিদারদের বেশীরভাগই ছিলেন ব্রাহ্মণ, তারা ছিলেন কংগ্রেসের সমর্থক। অন্যান্য উচ্চবর্ণের জমিদাররা জাস্টিসদের সমর্থন করতেন। ই ভি রামাসামী রাজনৈতিক আন্দোলন ছেড়ে, সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করলেন।

'কুদি-আরাসু' পত্রিকা : ১৯২৫ এর ২ মে ই ভি রামাসামী প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক 'কুদি-আরাসু' বা জনগণের রাজ পত্রিকা। পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন কে এম থাঙ্গাপেরুমল। এরোড থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকায় পাতা সংখ্যা ছিল ১৬। তামিলনাড়ু কংগ্রেসের সভাপতি থাকতে থাকতেই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তামিল সমাজের লাঞ্ছিত বঞ্চিত নিপীড়িত অংশ, যারা হিন্দু সমাজে শূদ্র-অতিশূদ্র(অস্পৃশ্য) বলে চিহ্নিত মানুষদের কথা যুক্তিপূর্ণভাবে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তিনি। 'কুদি-আরাসু' পত্রিকার মাধ্যমে ই ভি রামাসামী তাঁর সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি বিষয়ক চিন্তা-চেতনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও অভিজ্ঞতার কথা সহজসরল ভাষায় সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে শুরু করলেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত হিন্দু-পুরাণ নির্ভর ব্রাহ্মণ্য-ধর্মীয় সংস্কৃতি, প্রথা-পার্বণ, এবং জাতপাত-অস্পৃশ্যতা ভেদাভেদ সংক্রান্ত বিষয় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়ন, দ্রাবিড় সমাজের শিক্ষিত অংশের মধ্যে অতিদ্রুত প্রভাব ফেলতে শুরু করে।

এই তামিল সাপ্তাহিকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতপাত ভেদাভেদ ও ধর্মীয় কুসংস্কার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, এবং তাঁদের মধ্যে সামাজিক সমতা ও সৌভাতৃত্বের ধারণাকে জনপ্রিয় করে জাতপাত ব্যবস্থার সমূলে বিনাশ সাধন। 'কুদি-আরাসু' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই, -'কেন এই নতুন পত্রিকা প্রকাশ করছেন', শীর্ষক সম্পাদকীয় কলমে ই ভি রামাসামী লেখেন, -"দেশে অনেক সংবাদপত্র আছে, কিন্তু সেই সংবাদপত্রগুলি নিজেদের বিবেকের কাছে সৎ থাকতে ভয় পায়।.....তাই সেই পত্রিকাগুলির প্রতিমুখে দাঁড়িয়ে

আমি সাহসিকতার সাথে কথা বলার প্রস্তাব রাখতে চাই। ঠিক যেভাবে আমি সত্যকে দেখি।"[৪৪] কুদি-আরাসুর প্রথম পাতার উপরেই লেখা থাকত, তামিল কবি সুব্রামনিয়াম ভারতীর কবিতার লাইন 'সমস্ত মানুষই এক জাতের ও এক বর্ণের, জাতবিচার ভুল পার্থক্য করা পাপ।'[৪৫] এভাবে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে সমর্থ হলেন ই ভি রামাসামী।

আত্মমর্যাদা লীগ : ১৯২৫ সালের নভেম্বরে কংগ্রেস পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে এলেন ই ভি রামাসামী। ১৯২৪ এর 'ভাইকম আন্দোলন' ও ১৯২৫ এর 'গুরুকুলম এর ঘটনা'র অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তিনি একটি সামাজিক সংগঠন তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এইসময় কংগ্রেসের আরেক নেতৃত্ব এস রামানাথন (১৮৯৫-১৯৭০) তাঁকে একটি সামাজিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানালে, ই ভি রামাসামী তাতে যোগদান করেন। সেখান থেকেই অব্রাহ্মণদের (তথাকথিত শূদ্র ও অতিশূদ্র) অধিকার আদায়ের দাবিতে দক্ষিণ-ভারতে যে আন্দোলন এতদিন চড়াই-উৎরাই এর মধ্যে দিয়ে চলছিল, তাঁরা দুজনে তাকে আরো সংগঠিত রূপ ও দিশা দেওয়ার কথা চিন্তা করলেন। কংগ্রেসের 'অব্রহ্মণ' নেতা খাদি আন্দোলনকারী রামানাথন গান্ধির ভীষণ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু গান্ধির মুখে 'বর্ণাশ্রম-ধর্ম' এর কথা শুনে মোহভঙ্গ হয়েছিল রামানাথনের। ইতিপূর্বে তিনি 'আত্মমর্যাদা-লীগ' নামে একটি সামাজিক সংগঠন তৈরি করেছিলেন। যদিও তখনও পর্যন্ত সংগঠনটি সেভাবে সংগঠিত ও সক্রিয় ছিল না। নিজেদের মধ্যে আলোচনার পর তাঁর 'কুদি-আরাসু' পত্রিকা গোষ্ঠীর সদস্য ও আত্মমর্যাদা আন্দোলনকারীদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার মাধ্যমে ১৯২৫ সালে ই ভি রামাসামী ও এস রামানাথন সক্রিয়ভাবে শুরু করলেন, সুয়ামারিয়াদাই ইয়াক্কম বা 'আত্মমর্যাদা-আন্দোলন' (THE SELF RESPECT MOVEMENT)। 'কুদি-আরাসু' পত্রিকাকে এই সংগঠনের মুখপত্র রূপে ঘোষণা করা হল। দক্ষিণ ভারতে প্রায় দুই দশক ধরে আত্মমর্যাদা লীগ সামাজিক সংস্কার, ভাষা আন্দোলন, জাতিসত্তার অধিকার আন্দোলন, নারী অধিকার আন্দোলন, ধর্ম ও ঈশ্বর বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদির নানান সমাজ-রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল এবং পরিচালনা করেছিল। সামগ্রিকভাবে আত্মমর্যাদা আন্দোলনের আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ও বিষয় নয়। বর্তমান প্রবন্ধে আত্মমর্যাদা লীগের নেতৃত্বে সংগঠিত জাতপাত-অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের আলাপ-আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হল।

আত্মমর্যাদা লীগের নেতৃত্বে জাতপাত বিরোধী আন্দোলন : আত্মমর্যাদা লীগ পরিচালিত হত একটি নিরীশ্বরবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। জাতপাতের ব্যবস্থার বিনাশ করতে হলে হিন্দুধর্মের বিনাশ ঘটাতে হবে এই ছিল আত্মমর্যাদা আন্দোলনকারীদের মূল দৃষ্টিভঙ্গি। হিন্দুধর্মের কোনোরকম সংস্কারে তাঁরা বিশ্বাস করতেন না। তামিল সমাজে হিন্দুধর্মকে বহিরাগতদের ধর্ম বলে তুলে ধরেছিলেন তাঁরা। একটি যৌক্তিকতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ সংস্কারের কিছু বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পেরেছিল সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষের

এই লীগ। যার মধ্যে একটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং রাজনীতিকে প্রভাবিত করার মত ক্ষমতাও ছিল। আত্মমর্যাদা লীগ আয়োজিত বিভিন্ন সভায় ই ভি রামাসামী তামিল জনতার উদ্দেশ্যে বলতেন যে, 'ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের প্রধান প্রবক্তা বলে যাঁর কথা বলা হয়, সেই মনু এই ভূখণ্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে সমাজের একদম নীচের স্তরে নামিয়ে তাদের শূদ্র বলে ঘোষণা করেছিলেন। তারপর ব্রাহ্মণরা তাদের সম্পদ সঞ্চয়ের অধিকার কেড়ে নিয়ে, তাদের সমস্ত সম্পদ দখল করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের সেবা করাকেই নিম্নবর্ণের পেশা হিসেবে নির্দিষ্ট করেছিলেন। এরপর যখনই ব্রাহ্মণরা নিজেদের একছত্র অধিকারের বা সুযোগ সুবিধার নিরাপত্তার অভাববোধ করেছেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রীতি-নীতি, প্রথা ও বিধিনিষেধ চাপিয়ে দিয়ে অন্যান্য বর্ণের লোকেদের প্রত্যাহ্বানের মোকাবিলা করেছেন। এভাবে সম্প্রদায়গত বিভাজনের বিধানগুলির মাধ্যমে তারা সর্বক্ষেত্রে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অব্রাহ্মণ বা অনার্য অংশকে একটি নীচু অবস্থানের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। তাই এই অন্যায্য ব্যবস্থার অবসান হওয়া ভীষণ জরুরি। আর তা করতে হলে অনার্যদের 'আর্য-সাংস্কৃতিক-ইতিহাস' ও তাদের ধর্মের কবল থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে হবে।'[৪৬]

প্রতিটি সভায় তাঁরা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে তীব্র আক্রমণ করে যাবতীয় হিন্দু-পুরাণ ও শাস্ত্রগুলিকে দ্রাবিড়দের শূদ্র-অতিশূদ্র বানিয়ে পরাধীন রাখার উদ্দেশ্যে চক্রান্তকারী আর্যদের আখ্যান বলে চিহ্নিত করলেন। ১৯২৮ এর জুন মাসে ত্রিচিনোপল্লির লালগুড়ি সম্মেলনে 'দ্রাবিড়ীয়' পত্রিকার সম্পাদক জে এস কান্নাপ্পার জনসমক্ষে 'মনুস্মৃতি'র পুড়িয়ে অগ্ন্যুৎসব পালন করলেন। এই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল, আত্মমর্যাদা আন্দোলনকারীরা আর্য-ব্রাহ্মণদের কাজকর্মকে শুধু তুচ্ছতাচ্ছিল্য অবজ্ঞা করেই থামলেন না, পুরাণ বর্ণিত দেব-কাহিনিকে তাঁরা নিছক কাল্পনিক কাহিনি বলে তুলে ধরতে চাইলেন। মনুস্মৃতিতে তথাকথিত নিম্নবর্ণের প্রতি যে অপমানসূচক অমানবিক বক্তব্য রয়েছে তাঁরা সেগুলি মানুষের কাছে তুলে ধরে জাতপাত প্রথাকে ধ্বংস করার আহ্বান জানালেন। আত্মমর্যাদা লীগের এইসমস্ত প্রচার ও কাজ দেখে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরা এই ধরনের কাজকে হিন্দু ভাবাবেগে আক্রমণ বলে চিহ্নিত করে সরকারের কাছে অভিযোগ জানালেন।

তামিলনাড়ুতে আত্মমর্যাদা লীগই প্রথম সংগঠন যার সদস্যরা সমাজের নিপীড়িত, শোষিত অংশের মানুষের মধ্যে থেকে এসে নিপীড়িত শ্রেণির বক্তব্য তুলে ধরতে লাগলেন। তাঁরা কীভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদ দ্বারা শোষিত সেই কথা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে লাগলেন। স্বাভাবিকভাবেই নিম্নবর্ণ ও অবর্ণ অংশের মানুষের কাছে পৌছানোর যে প্রচেষ্টা তাঁদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল তা সমাজে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা নির্মাণে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছিল। ভান্নিকুলা-ক্ষত্রিয়, নাডার, আগমুদিয়া, ইসাই ভেল্লালা সম্প্রদায়ের মানুষরা, হিন্দু বর্ণ-কাঠামোয় যাদের স্থান ছিল একদম নীচে, যাদের জীবনে দুরাবস্থার কোনো সীমা ছিল না, আত্মমর্যাদা আন্দোলনকারীরা তাদের একদম কাছ অবধি পৌছাতে পারলেন। মেহনতি মানুষের জীবনযন্ত্রণার কথা নিজেদের বক্তৃতায় ও লেখালিখিতে তুলে ধরলেন তাঁরা। সমাজের নিম্নবর্ণীয়দের এমন দুরাবস্থার জন্য সরকারকে দায়ী করে তাঁরা।

যদিও আত্মমর্যাদা আন্দোলনকে শুধুমাত্র জাতপাত-অস্পৃশ্যতা বিরুদ্ধে সংগ্রাম বলে

ধরে নিলে ভুল হবে। এই আন্দোলন গড়ে ওঠার সময় থেকেই এই আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী মতাদর্শের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাওয়া এই আন্দোলন সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজেদের কাজকর্মকে প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছিল। ভারত ভূখণ্ডের অন্যান্য অংশে নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্যদের অধিকারের দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেগুলির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের আত্মমর্যাদা আন্দোলনের পার্থক্য ছিল, এই আন্দোলন অব্রাহ্মণ বা নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য বা দলিত পরিচয়কে অস্বীকার করে নিজেদের দ্রাবিড় বা তামিল জাতীয়তাবাদী পরিচয়কে সামনে আনতে পেরেছিল। ব্রাহ্মণ তামিলদের তাঁরা বহিরাগত আর্য-জাতির বংশধর বলে মনে করতো। তাঁদের এই ধারণার কারণ ছিল, আয়োদি থাস, পি লক্ষ্মী নারাসু, মারাইমালাই আদিগাল প্রভৃতি তামিল চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুসমাজের পরিচয়ের বাইরে একটি নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক চিন্তাভাবনার পুনরুত্থান ঘটাতে পেরেছিলেন।

১৯২৯ সালের ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি চেংগলপুটে আত্মমর্যাদা আন্দোলনের প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে আত্মমর্যাদা লীগ (SELF-RESPECT LEAGUE) নামটি আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে নাডার সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব সৌন্দরপান্ডিয়া বলেন, 'ব্রাহ্মণরা তামিলদের মধ্যে জাতপাত-বিভাজন তৈরি করেছে। তামিল ধ্রুপদী সাহিত্য 'তিরু-কুরাল' ও 'সিলাপ্পাটিকরম' এ তামিল সমাজে সম্প্রদায়গত বিভাজনের কোনো কথা লেখা নেই। কিন্তু সংস্কৃত পুরাণ, বেদ, আগম প্রভৃতি, যেগুলি আর্য মিথ্যাচারের দলিল, সেগুলিতে মানুষে মানুষে সর্বদায় বিভাজন করা হয়েছে, মানুষের ঐক্য নষ্ট করা হয়েছে, কী কারণে? যেসমস্ত কাজকর্ম সমাজে অসমতা তৈরি করে রেখেছে, তার ভিত্তি হল এই জাতপাত ব্যবস্থা। সৌন্দরপান্ডিয়ার বক্তব্যের বিষয়বস্তু তামিল বুদ্ধিজীবী সমাজের কাছে অচেনা ঠেকলেও তিনি তাঁদের অনুরোধ করলেন, বেদ, পুরাণকে সাহিত্য বলে মানার চেয়ে বরং সেগুলিকে 'আবর্জনার স্তূপ' বললে উপযুক্ত শোনাবে।'[৪৭]

জাতপাত অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে চেংগলপুট সম্মেলনে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তা ছিল অভূতপূর্ব। এই সম্মেলনের উপস্থিত প্রতিনিধিরা ঘোষণা করলেন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা নির্ধারিত ও পরিচালিত হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন রীতিনীতিগুলি হল পুরোহিতদের অনর্জিত উপার্জনের মাধ্যম। যখন থেকে দক্ষিণ ভারতের সমাজে হিন্দু-অনুশাসন এবং পুরোহিততন্ত্র দ্বারা নির্ধারিত জীবন প্রণালী চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ব্রাহ্মণদের জন্য বিশেষ ক্ষমতা সুরক্ষিত করা হয়েছে, তখন থেকেই সমাজ জাতপাতে বিভক্ত হয়েছে। তাই আন্দোলনকারীরা সিদ্ধান্ত নিলেন,- সমাজের অব্রাহ্মণ অংশ মন্দিরে পূজা করতে গেলে কোনোদিনই এই সমাজ অস্পৃশ্যতা থেকে মুক্ত হতে পারবে না, তাই অব্রাহ্মণদের মন্দিরে পূজা দিতে যেতে বা মন্দিরের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করলেন তাঁরা।

মন্দিরে পূজা দিতে যাওয়া নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বাধা দান করার পিছনে আত্মমর্যাদা আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য ছিল, ব্রাহ্মণদের জন্মগত পৌরোহিত্যের কারবারের অধিকারকে সমূলে উচ্ছেদ করা। পাশাপাশি তাঁরা এই সিদ্ধান্তও নিলেন যে, মন্দিরের রোজগার আর

ধার্মিক অনুষ্ঠান ও উৎসব উদযাপনে খরচ করতে দেওয়া যাবে না। সেই অর্থ সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের কারিগরি শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, শিল্প-প্রযুক্তি গবেষণা এবং আপামর জনগণের স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে। এই সম্মেলনের মূল সিদ্ধান্তগুলি ছিল, — (১) একটা টাকাও অথবা তার সমমূল্যের কোনো দ্রব্যবস্তু পূজা বা মন্দির অথবা অন্য কোথাও ঈশ্বরের নামে খরচ করা যাবে না। কোনো পূজায় পুরোহিত অথবা ঈশ্বরের ও মানুষের মাঝে মধ্যস্ততাকারী নিয়োগ করা যাবে না। (২) আর একটাও নতুন মন্দির নির্মাণ করা যাবে না। মন্দিরের বা মঠের যাবতীয় রোজগার, সম্পত্তি প্রযুক্তিমূলক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও শিল্প-গবেষণার কাজে ব্যয় করা হবে। (৩) মন্দিরে উৎসব অনুষ্ঠান বন্ধ করে সেই টাকা জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রচার ও প্রদর্শনীর কাজে ব্যয় করা হবে। জাস্টিস পার্টির পক্ষ থেকে যাঁরা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা এই সব সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেন। কেউ কেউ ভক্তদের মন্দিরে যাওয়ার স্বাধীনতার কথা তুলে তাঁদের ছাড় দেওয়ার দাবি জানান। কিন্তু ই ভি রামাসামী এবং তাঁর সমর্থকদের ব্যাপক সমর্থন পেয়ে তিনটি সিদ্ধান্তই সম্মেলন মঞ্চে পাশ হয়ে যায়।[৪৮]

আত্মমর্যাদা লীগের চেংগলপুট সম্মেলনে আত্মমর্যাদা আন্দোলনকারীরা ধর্মীয় বিবাহে আপত্তি জানিয়ে মন্দির ও গৃহ অনুষ্ঠানে পুরোহিতের অপ্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরলেন। কারণ পুরোহিতগিরি শুধু রোজগার নয়, এই জীবিকা শুধুই ব্রাহ্মণদের জন্য সংরক্ষিত। আর এজন্যই তারা সমাজে বিশেষ সম্মান ও সুবিধা আদায় করে থাকে। অন্য কোনো শ্রমসাধ্য কাজ না করেই তারা এভাবে সচ্ছল জীবন কাটায়। অন্যদিকে নিম্নবর্ণীয় অংশকে সারাজীবন কয়েক টুকরো রুটির জন্য শ্রম করে যেতে হয় অথচ তারা প্রাপ্য সম্মান সমাজের কাছে পায় না। তাই ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের বয়কটের ডাক দিল এই সম্মেলন মঞ্চ। এই সম্মেলন মঞ্চ সমস্ত সরকারি-বেসরকারি রাস্তা পুকুর স্কুল ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে যাতে সমস্তরকমের জাতপাতগত বৈষম্যের অবসান ঘটানো যায়, সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। স্কুলের পাঠক্রমে কোনোরকম হিন্দুত্ববাদী ধ্যানধারণাকে তুলে ধরে এমন বিষয় রাখা যাবে না, বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আত্মমর্যাদা আন্দোলনকারীরা। সমাজে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা আত্মমর্যাদা অর্জনের পূর্বশর্ত বলে ঘোষণা করেন তাঁরা।

ই ভি রামাসামীর প্রস্তাবে এই সম্মেলনে ধর্মীয় বিবাহ বন্ধ করে 'আত্মমর্যাদা-বিবাহ' (যদিও বিবাহ শব্দের অর্থ বিশেষভাবে বহন করা, তাই এই ধরনের বিবাহ পদ্ধতিকে 'বিবাহ' শব্দটি যে অর্থ বহন করে, তা দিয়ে সঠিকভাবে প্রকাশ করা যায় না অথবা বোঝা যায় না) চালু করতে হবে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন আত্মমর্যাদা লীগের সদস্যরা। রামাসামী একটি যৌক্তিক পদ্ধতিতে পুরুষ-নারী উভয়ের মতামতের ভিত্তিতে বিবাহের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি সদস্যদের মধ্যে বুঝিয়ে বলেন। সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা তাঁর এই নতুন ভাবনার কথা জেনে ভীষণ উৎসাহিত হন। সমাজে নতুন পদ্ধতিতে বিবাহের প্রচলন করার সঙ্গেসঙ্গে, সমস্ত ধার্মিক রীতি-নীতি ছুঁড়ে ফেলে, ব্রাহ্মণদের মন্ত্রোচ্চারণ বিবাহ-পদ্ধতিকে নাকচ করার পক্ষে মত দেন তাঁরা। আত্মমর্যাদা-বিবাহের পদ্ধতি ছিল পরস্পর সহমত হলে, শুধু একটি মালা বদল করে নিজেদের মাতৃভাষায় একসঙ্গে থাকার অঙ্গীকার করলেই বিবাহ

সম্পন্ন হয়ে যেত। আত্মমর্যাদা বিবাহে হিন্দুসমাজের প্রচলিত জাতপাতগত পরিচয়ের ভিত্তিতে বিবাহকে অবৈজ্ঞানিক ও অসভ্য বলে উল্লেখ করা হয়। আত্মমর্যাদা-বিবাহে আড়ম্বর করে কোনো খরচ করা হতো না। সম্মেলনে রামাসামী তাঁর বক্তব্যে বিবাহ সংস্কারে অনাড়ম্বরভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার কথা বলতে গিয়ে বলেন, অধিক খরচ করা অনুষ্ঠান যুক্তিবাদী চিন্তা ও সমাজ প্রগতির পরিপন্থী। এই বিবাহ পদ্ধতিকে সেকুলার বিবাহ বলা হতো।

সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মত বহু আত্মমর্যাদা আন্দোলনকারী ধর্মগত ও জাতপাতগত পরিচয়কে ছুঁড়ে ফেলে বিবাহে অংশগ্রহণ করতে থাকে। দক্ষিণ ভারতের সমাজে জাতপাতগত ধারণাকে ছুঁড়ে ফেলে এই ধরণের বিবাহ আন্দোলনের সমর্থকদের মধ্যে জাতপাত সংক্রান্ত ধারণাকে ভেঙে দেওয়ার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এই সম্মেলনে আত্মমর্যাদা আন্দোলনকারীরা তাঁদের পদবী যা জাতপাতের পরিচয় বহন করে তা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পেরিয়ার ই ভি রামাসামী এই সম্মেলনে তাঁর পদবী 'নায়কর' ত্যাগ করেন। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলিতে দেবদাসী প্রথা প্রচলিত ছিল। দেবদাসীরা ছিল ভেল্লালা সম্প্রদায়ের। সমাজের ব্রাহ্মণরা ভেল্লালা সম্প্রদায়ের নারীদের মন্দিরে দান করতে হবে, এমন নিয়মকে তাদের উপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করেছিল। যার ফলাফল ছিল ভেল্লালারা সমাজে নিকৃষ্ট জাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল এবং এর ফলে এই সম্প্রদায়ের বহু নারী বেশ্যাবৃত্তি করে জীবন চালাতে বাধ্য হতো। ১৯৩০ সালে অনুষ্ঠিত আত্মমর্যাদা আন্দোলনের দ্বিতীয় সম্মেলনে দেবদাসী প্রথাকে উচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঠিক এই সময় ডাঃ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি নামে এক সমাজ সংস্কারকের করা মামলায় ১৯৩০ সালে মাদ্রাজ বিধান-পরিষদ এই প্রথাকে সীমিত করার কথা ঘোষণা করে এবং আইন তৈরি করে। ই ভি রামাসামী এই সম্মেলনে বিধান-পরিষদের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান।

ই ভি রামাসামীর চিন্তাভাবনা : দক্ষিণ-ভারতে সমাজ সংস্কার আন্দোলন বিষয়ে ই ভি রামাসামীর উপলব্ধির মূল জায়গা ছিল, আর্য-ব্রাহ্মণদের বাইরে থাকা জনগোষ্ঠীগুলিকে, আর্য-ধর্মীয় সংস্কৃতির দাসত্বের বন্ধন থেকে বের করে আনা। তিনি মনে করতেন, তা করতে পারলেই জাতপাত-অস্পৃশ্যতাই শুধু নয় সাধারণ মানুষকে অনেকটাই কু-সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও অর্থহীন প্রথাগুলি মেনে চলা থেকে মুক্ত করা যাবে। স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি শুরুতেই জোর দিয়েছিলেন, তামিল সমাজে এক ধারাবাহিক প্রচার সংগঠিত করার কাজে। যার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল হিন্দুত্বকে একটি নির্দিষ্ট ধর্ম হিসেবে তুলে ধরা। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে তিনি মূল যে যুক্তি তুলে ধরেছিলেন তা হল— (১) হিন্দুধর্ম বাইরে থেকে দক্ষিণ-ভারতে এসেছে। (২) হিন্দুত্ববাদের মূল ধারণা প্রথিত আছে বর্ণাশ্রম অর্থাৎ বর্ণ-বিভাজন ধারণার মধ্যে। এই ধর্ম দ্রাবিড়দের কাছে অপরিচিত কারণ তাদের প্রাচীন তামিল ধ্রুপদী সাহিত্যের যে ধারা রয়েছে, সেখানে কোনোরূপ বৈষম্যযুক্ত সমাজব্যবস্থার ইঙ্গিত নেই। এটা ইতিহাস থেকে পাওয়া ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ একটি উদাহরণ, যা তিনি দ্রাবিড় সমাজের সামনে তুলে এনেছিলেন। তিনি বলেন, — 'এই উদাহরণের ভিত্তিতেই এটা জোর দিয়ে বলা যায় যে, বর্তমানে দ্রাবিড় সমাজে যে সমস্ত ধর্মীয় সংস্কার,

রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে তার সঙ্গে প্রাচীন যুগের তামিলদের ধর্মীয় সংস্কৃতি ও রীতিনীতি অনুশীলনের কোনোরকম যোগাযোগ নেই।' 'এমনকি যে সমস্ত হিন্দু দেবদেবীর নাম এবং ধর্মীয় পরিভাষা, যেগুলির মানুষকে আবিষ্ট করার মত অর্থ রয়েছে, সেসবই আসলে ব্রাহ্মণদের নির্মাণ, তামিলদের সেসবে কোনো ভূমিকা কোনোদিনই ছিল না বা নেই। এই ব্রাহ্মণরাই অতীতের আর্যদের বংশধর।'

এভাবে ই ভি রামাসামীর একের পর এক বক্তব্য ও রচনায় উঠে আসতে লাগল দ্রাবিড়দের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ। তিনি লিখলেন,- 'আর্যরা যখন দক্ষিণের দিকে প্রবেশ করলেন, তখন তারা দ্রাবিড়দের উন্নত সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেখে হতাশ হলেন। এবং তারা এটাও বুঝতে পারলেন যে, এই ধরনের একটি এগিয়ে থাকা সমাজব্যবস্থায় বসবাসকারী মানুষদের তখনই নীচে নামিয়ে অধীনস্ত করা সম্ভব, যখন একটি ষড়যন্ত্রমূলক পদ্ধতিতে তাদের সমাজ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চেতনাকে আক্রমণ করা যাবে। এক্ষেত্রে আর্য-ব্রাহ্মণরা প্রধান হাতিয়ার রূপে যা ব্যবহার করলেন তা ছিল, দ্রাবিড় সমাজের মধ্যে জটিল নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করা। যা সেসময়ের দ্রাবিড় রাজারা ও ব্যাবসায়ী সম্প্রদায় নির্লজ্জভাবে মেনে নিয়েছিলেন। বহিরাগত আর্যদের উপর বিশ্বাস করে তারা তাদের অযৌক্তিক কথার জালে ফেঁসে গিয়েছিলেন এবং এভাবে তারা অলৌকিক শক্তির উপস্থিতিকে মান্যতা দিতে শিখেছিলেন। তারা ভেবেছিলেন ওইসব রীতিনীতি মেনে নিলে তারা পার্থিব জীবনে আরো লাভবান হতে পারবেন। প্রকৃতপক্ষে দ্রাবিড় রাজা ও সমাজের অন্যান্য মানুষরা সেসময়ে এটা বুঝতে অসমর্থ হয়েছিলেন যে, তাদের সামনে ব্রাহ্মণরা যে সকল রীতিনীতি ও প্রথা মানার কথা বলছেন, তা আসলে একটা টোপ। তা গিলে ফেললেই তারা ব্রাহ্মণদের অধীনস্ত হয়ে পড়বেন।' 'তারপর যখন দ্রাবিড়রা ব্রাহ্মণদের তৈরি বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও বিধিনিষেধ দ্বারা পরিচালিত হতে থাকলেন, তখন ব্রাহ্মণরাই হয়ে উঠলেন তাদের তত্ত্বাবধায়ক এবং এভাবে ব্রাহ্মণরা দ্রাবিড়দের নির্ভরতা অর্জন করে, একসময় দ্রাবিড়দের এটা বোঝাতে সক্ষম হলেম যে, ব্রাহ্মণরা তাদের চেয়ে 'উন্নত-মানব'। তারপর ধীরে ধীরে বর্ণ-ব্যবস্থা প্রচলন করে, এক দীর্ঘ সময়ের চর্চার মাধ্যমে দ্রাবিড়দের সমাজের নীচে থাকা 'শূদ্র' উপাধিতে ভূষিত করলেন ব্রাহ্মণরা।[৪৯]

শূদ্রাতিশূদ্রদের মধ্যে আত্মমর্যাদা আন্দোলনের প্রভাব : আত্মমর্যাদা আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকেই, আত্মমর্যাদা লীগের কর্মীরা সমাজের একদম নীচু তলার মানুষজনের মধ্যে নিজেদের বক্তব্য পৌঁছে দিতে সমস্তরকম সদর্থক উদ্যোগ নিলেন। তামিল সমাজে এরকম দুরাবস্থায় থাকা স্থানীয় নিম্নবর্ণীয় সম্প্রদায় ছিল, নাডার, আগমুদাইয়া, ইসাই ভেল্লালা, সেনগুন্থাস, পারিয়া ও পাল্লাল। তামিল-নাড়ুর প্রতিটি জেলাতেই সম্মিলিতভাবে এরাই ছিলেন অধিক সংখ্যক। 'এদের মধ্যে নাডারদের পেশা ছিল তাড়ি-প্রস্তুত করা। এদের হাতে জমিজমা ছিল না বললেই চলে। এদের অবস্থান ছিল বর্ণ-কাঠামোয় থাকা শূদ্রদের চেয়েও নীচে।'[৫০] নাডারদের অচ্ছুৎ বলে ঘৃণা করত উচ্চবর্ণীয়রা। 'আগমুদাইয়ারা রাজা ও জমিদারদের বাড়ি-বাগান দেখভালের কাজ করতেন। মাদুরাই, তাঞ্জোর ও ত্রিচিনোপল্লিতে এরাই ছিলেন

সংখ্যায় অধিক। এদের পেশাকে নীচু মনে করা হতো এবং হিন্দু-ধর্মে এদের স্থান ছিল শূদ্রের সমতুল্য।'[৫১] ইসাই ভেল্লালাদের শূদ্র বলে চিহ্নিত করা হতো। দেবদাসী এবং ভেল্লালা সমার্থক শব্দ। এই সম্প্রদায় থেকেই কিশোরী নারীদের মন্দিরে নর্তকী ও গায়িকা হিসেবে নিয়োগ করা হতো। তাঞ্জোর, ত্রিচিনোপল্লি ও কোয়েম্বাটোরে প্রায় ১৮২৩, ১২৬০ ও ১২২৮ টি বড় মন্দিরে এই সম্প্রদায়ের নারীরা নিযুক্ত ছিল। সমাজে এরা বেশ্যাদের সম্প্রদায় বলে অপমানিত হতো।[৫২]

কোয়েম্বাটোর, উত্তর আরকট ও সালেমে থাকত সেনগুন্থাস সম্প্রদায়। এরা পেশায় তাঁতি হলেও এদের শূদ্র বলে অস্পৃশ্য মনে করা হতো। বিংশ শতাব্দীতে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু শিক্ষিত মানুষ ছিল।[৫৩] ভান্নিয়াকুল্লা ক্ষত্রিয়রা ছিলেন মূলত কৃষক। আরকট ও চেংগলপুটে এরা ছিলেন সবচেয়ে আদি অধিবাসী। আর্থিকভাবে এরা ছিলেন দরিদ্র এবং হিন্দু-সমাজে এরা সম্মানিত ছিলেন না। পাল্লা ও পারিয়াহদের অবস্থা ছিল ক্রীতদাসের মতো। এরা হিন্দু-উচ্চবর্ণ এবং ভেল্লালা জমিদারদের জমিতে 'বন্ডেড মজুর' হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হতেন।[৫৪] ব্রিটিশ সরকার আইন করে পাল্লা ও পারিয়াহদের দাসত্বের জীবন থেকে মুক্ত করে তাদের কৃষি-মজুর হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। এর ফলে তাদের সামাজিক অবস্থানের সামান্য উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু আইন থাকা সত্ত্বেও সবর্ণ-হিন্দুরা তাদের অস্পৃশ্য বলেই গণ্য করত এবং সমাজে তাদের স্থান ছিল সবচেয়ে নীচে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এই সব সম্প্রদায়গুলিতে কিছু যুবক শিক্ষিত হওয়ায় তারা তাদের সম্প্রদায়ের এই দুর্দশা ও মর্যাদাহীন জীবন থেকে মুক্তি দিতে সংগঠিত হয়েছিলেন। সেরকম কয়েকটি সংগঠন ছিল, 'নাডার মহাজন সংগম' (১৯১০), 'সেনগুন্থাস মহাজন সংগম' (১৯০৮), 'ভান্নিকুল্লা ক্ষত্রিয় মহাজন সংগম' (১৯১৯), 'বিশ্বকর্মা মহাজন সংগম' (১৯১২) প্রভৃতি। এই সকল সংগঠনগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সমাজে সম্মানজনক স্থান দাবি করা। এই জন্য তারা সরকারি খাতায় নিজেদের অপমানজনক পদবি বদলে ফেলেছিলেন। এমনকি এদের একটা সামান্য অংশ বিভিন্ন সরকারি কাজেও যুক্ত হয়েছিলেন।

ই ভি রামাসামীর নেতৃত্বে আত্মমর্যাদা আন্দোলন শুরু হলে, এই সব সংগঠনগুলি তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে নিজেদের মনের কথাগুলি খুঁজে পাচ্ছিলেন। তাই একসময় দেখা গেল উপরিউক্ত প্রতিটি সংগঠন আত্মমর্যাদা আন্দোলনকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসছেন। এমনকি জাস্টিস পার্টির চেয়ে আত্মমর্যাদা লীগকেই এই সমস্ত নিম্নবর্ণীয়দের সমগঠনগুলি অধিক ভরসাযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। এর মূল কারণ ছিল জাস্টিস পার্টির নেতৃত্ব জাতপাতের অবসান চাইলেও তাঁরা তাঁদের প্রচারে হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করতেন না। অন্যদিকে আত্মমর্যাদা লীগ নেতৃত্ব তাঁদের প্রচারে সমাজে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলতেন এবং কঠোরভাবে হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করতেন। নাডার সম্প্রদায়ের নেতা সৌন্দরপান্ডিয়া নাডার মনে করতেন রামাসামীর সংস্কার আন্দোলন নিম্নবর্ণীয়দের সচেতন করবে এবং এর মাধ্যমে তারা তাদের বৈধ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে। ফলে তারা সামাজিক-ধর্মীয় অসমতা দূরীকরণে রাজনৈতিক দলগুলিকে বাধ্য করতে পারবেন। পুরনো ধর্মীয় প্রথা ও

রীতিনীতি ভেঙে প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সংস্কার চালানোর যে উদ্যোগ আত্মমর্যাদা আন্দোলনের কর্মীরা নিয়েছিলেন, তা সৌন্দরপান্ডিয়ার কাছে ভীষণ বিশ্বাসযোগ্য হয়েছিল। 'এই কারণেই নাডারদের এক বড় অংশ হিন্দু-ধর্মীয় প্রথাগুলি পরিহার করে নিজেদের জীবন-শৈলীর বি-হিন্দুকরণ ঘটাতে পেরেছিলেন। তারা নিজেদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, গৃহ অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ডাকা বন্ধ করে দিলেন।'[৫৫]

'নাডার সংগমে'র নেতৃত্বের দেখাদেখি অন্যান্য সম্প্রদায়ের নেতারাও একই পথ অনুসরণ করলেন। এরা সকলেই ই ভি রামাসামীকে সমগ্র তামিল-জাতির নেতা রূপে গ্রহণ করলেন এবং আত্মমর্যাদা লীগের সাথে এক হয়ে গেলেন। রামাসামীর সঙ্গে কণ্ঠস্বর মিলিয়ে তাঁরা প্রতিটি সভায় ব্রাহ্মণদের বিশেষ মর্যাদা খারিজ করতে লাগলেন। একথা বলা ভুল হবে না যে, এভাবে সরসরি সম্প্রদায়ের নেতাদের সমর্থন পেয়ে যাওয়া, ই ভি রামাসামীর পক্ষে অতিদ্রুত আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে ভীষণ সহায়ক হয়েছিল।

আত্মমর্যাদা সমাজ সংস্কার আন্দোলন শুরু হওয়ার একবছরের মধ্যেই মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির প্রতিটি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি জেলায় একটি করে প্রায় ৬০টি শাখা সংগঠন তৈরি হয়। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ মফঃস্বল শহরগুলিতে একাধিক শাখা তৈরি হয়। এই শাখাগুলির বেশির ভাগ ছিল তাঞ্জোর, কোয়েম্বাটোর, রামনাড, তিনেভেল্লি, উত্তর ও দক্ষিণ আরাকট জেলায়। এছাড়াও ছিল বেশ কিছু সমমনস্ক সমর্থক সংগঠন। এই সংগঠনগুলি জাতপাত-অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রচার চালাতো। কারো বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান হলে সেখানে ব্রাহ্মণদের ডেকে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা যে অর্থহীন সেবিষয়ে মানুষকে সচেতন করতো, এবং অনেকক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের সামাজিকভাবে বয়কট করতে তামিলদের ইন্ধন যোগাতো। নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত মানুষরা কোনোভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদী নির্যাতনের বা হেনস্তার স্বীকার হলে আত্মমর্যাদা আন্দোলনকারীরা তীব্র প্রতিবাদ জানাতো।

১৯৩২ সালে ই ভি রামাসামী সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া) সফরে যান। সেখানে কোনোরকম বর্ণ-বিদ্বেষহীন অথবা জাতপাত-অস্পৃশ্যতা বিভাজন মুক্ত রাশিয়ানদের দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। রাশিয়ার প্রতিটি মানুষ তাদের কাজকর্ম ও যোগ্যতার নিরিখে উপযুক্ত সম্মান পেয়ে থাকেন। এই সময় সারা ইউরোপ ও আফ্রিকার কিংদংশ ভ্রমণ করেছিলেন তিনি। দেশে ফিরে তিনি রাশিয়ার সমাজব্যবস্থাকে জাতপাত বিভাজন ও ধর্মের গোঁড়ামি মুক্ত বিশ্বের সবচেয়ে সুখি সমাজ বলে মন্তব্য করেন। বিশ্বভ্রমণ থেকে ফিরেই তিনি আত্মমর্যাদা আন্দোলনের সঙ্গে সাম্যবাদী মতাদর্শের মেলবন্ধন ঘটান। ফলস্বরূপ ১৯৩৩ সালে তিনি একটি রাজনৈতিক দল 'সমধর্ম সোশ্যালিস্ট পার্টি'র গড়ে তোলেন। যদিও পরে এই আন্দোলন থেকে সরে আসেন তিনি। ১৯৩৭ হিন্দি ভাষা আগ্রাসন বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ই ভি রামাসামী। এই সময় এই আন্দোলন থেকেই তিনি জাস্টিস পার্টির দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং আত্মমর্যাদা আন্দোলনের পরিধি সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

স্বাধীনতা পরবর্তী জাতপাত বিরোধী আন্দোলন : ১৯৪৭ এর অগাস্টে ভারতরাষ্ট্র 'স্বাধীন' হওয়ার পর খুব শীঘ্রই মানুষের কাছে 'স্বাধীনতা' সংক্রান্ত 'পেরিয়ার' রামাসামীর বক্তব্য

সত্যি প্রমাণিত হয়। ১৯২৭ সাল থেকে তামিলনাড়ুতে তফশিলি জাত, জাতির যে সরকারি সংরক্ষণ চালু ছিল, তার বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে মাদ্রাজের 'ব্রাহ্মণ কল্যাণ সমিতি'। এপ্রিল ১৯৫০এ দুজন ব্রাহ্মণ ছাত্র মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে জাত, জাতি ভিত্তিতে সংরক্ষণের বৈধতাকে প্রত্যাহ্বান করে মাদ্রাজ হাইকোর্টে মামলা করে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ – ২২৬ এ উল্লিখিত সমতার অধিকারের কথা তুলে তারা সংরক্ষণকে সমানাধিকারের পরিপন্থী বলে মন্তব্য করে। ২৮ শে জুলাই ১৯৫০ এই মামলায় মাদ্রাজ হাইকোর্ট মামলাকারী ছাত্রদের আবেদনের স্বপক্ষে রায় ঘোষণা করে।

'পেরিয়ার' রামাসামী এর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। তিনি দেখলেন, দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে তফসিল তালিকায় থাকা জাত, জাতিরা সংরক্ষণের যে সুবিধা আদায় করেছিলেন, সে লড়াই এখন জলে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে। মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ১৪ই অগাস্ট তিনি 'সম্প্রদায় অধিকার দিবস' পালন করার ডাক দিলেন। সংবিধানের দোহাই দিয়ে এভাবে সংরক্ষণ তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে 'দ্রাবিড় কাঝাগম' (১৯৪৪ সালে এই সংগঠন তৈরি করেন রামাসামী)। মাদ্রাজ স্টেটের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ কর্মসূচী গ্রহণ করে। প্রতিবাদী তামিল জনগণ আওয়াজ তুললেন, 'আমরা আমাদের সম্প্রদায়গত সংরক্ষণ ফেরত চাই', 'সংবিধান নিপাত যাক'। দ্রাবিড় কাঝাগম প্রতিষ্ঠার পর এটাই ছিল তাদের প্রথম সংগঠিত প্রতিবাদ। ২৭ অগাস্ট সুপ্রিমকোর্ট মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায় বহাল রাখলে সংবিধান সংশোধন করে সংরক্ষণকে পুনর্বহাল করার দাবি জানায় আন্দোলনকারীরা। ১৯৫০ এর ডিসেম্বরে 'পেরিয়ার' রামাসামীর আহ্বানে ত্রিচিতে অনুষ্ঠিত হয়, 'সম্প্রদায়গত অধিকার রক্ষা সম্মেলন'। কংগ্রেসের মন্ত্রীরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে এলে তাদের কালো-পতাকা দেখিয়ে ধিক্কার জানায় নিম্নবর্ণীয় তামিল জনতা। মাদ্রাজ বিধানসভা এই সময় পরিস্থিতি সামাল দিতে একটি সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিল পাশ করে। কিন্তু এই বিল মানতে অস্বীকার করে কেন্দ্রীয় সরকার। এইসময় তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল মাদ্রাজে বিক্ষোভ আন্দোলনের পরিস্থিতিকে প্রশমিত করতে এলে, ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে পড়েন। তিনি দিল্লি ফিরে গেলে ১৮ জুন ১৯৫১ সংবিধানে প্রথম সংশোধন করে তফসিলভুক্ত জাত, জাতির জন্য সরকারি শিক্ষা, চাকরি ও পদে সংরক্ষণ পুনর্বহাল করা হয়। এভাবে 'স্বাধীন' ভারতের প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনে 'পেরিয়ার' রামাসামী সফল হন।

১৯৫২ সালে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী রাজাগোপালচারি ক্ষমতায় এসেই এক নতুন শিক্ষানীতি নিয়ে আসেন। এই শিক্ষানীতিতে বলা হয়, ছাত্রছাত্রীরা সকালে স্কুলে পড়াশোনা করবে ও বিকেলে তারা তাদের মা বাবার সাথে বংশগত পেশার শিক্ষা নেবে। রামাসামী এই শিক্ষানীতিকে 'কুলা কলভই থিওম' বা পূর্বপুরুষের পেশা ধরে রাখার শিক্ষানীতি বলে তীব্র সমালোচনা করলেন। 'ভিদুথালাই' পত্রিকায় কংগ্রেস সরকারের শিক্ষানীতি নিয়ে তিনি লিখলেন, "এই শিক্ষানীতি একটি জাতপাত ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চাওয়া শিক্ষানীতি। এর শুধু প্রতিবাদ করলেই হবে না, যেভাবে হোক একে দূর করতে হবে। এই শিক্ষানীতি কি সমাজে বর্ণাশ্রম প্রথার পুনর্নির্মাণ ও তাকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা নয়? কে জাতপাতে বিভক্ত এমন একটি সমাজে কায়িক শ্রমিক ও ক্রীতদাস হয়ে থাকতে চায়বে? শুধুমাত্র যাদের শূদ্র

বলে চিহ্নিত করা হয় তারা কি শুধুমাত্র পৈতৃক পেশাতেই নিযুক্ত থাকব। আর অন্যদিকে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ব্রাহ্মণরা উচ্চ-অবস্থান, পেশা ও পদ লাভ করে উচ্চ থেকে উচ্চতর অবস্থানে বিরাজ করবেন? আমরা কখনোই মনে করি না যে, কায়িক শ্রম অসম্মানের কিন্তু শুধুমাত্র আমরাই কেন সেই কাজ করতে থাকব? তাহলে এই নীতি (শিক্ষা) কীসের জন্য? তা কি তাঁর (রাজাগোপালাচারি) নিজের সম্প্রদায়কে অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের অবস্থান সমাজে সুরক্ষিত করার জন্যই নয়? তিনি যতদিন ক্ষমতায় থাকবেন ব্রাহ্মণদেরই সমস্ত সরকারি উচ্চপদে নিয়োগ করতে থাকবেন।"[৫৬] 'পেরিয়ার' রামাসামীর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য, তামিলনাড়ুতে শিক্ষানীতি বিরোধী আন্দোলনের জন্ম দেয়। সারা তামিলনাড়ুর জনগণ নতুন শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সভা ও মিছিলে সামিল হন।

১৯৫৭ সালে নির্বাচন শেষ হওয়ার পর 'পেরিয়ার' রামাসামী জাতপাত-অস্পৃশ্যতা উৎখাতের লক্ষ্যে আন্দোলন আরো জোরদার করার ডাক দেন। সেই সময় ব্রাহ্মণ-মালিকরা তাদের হোটেলের বাইরে লিখে রাখত, 'ব্রাহ্মণ হোটেল'। এই হোটেলগুলিতে অন্য জাতের অর্থাৎ নিম্নবর্ণীয়রা প্রবেশ করতে পারতো না। তামিলনাড়ুর সরকারি ভবন সংলগ্ন কোনো কোনো হোটেলে তাদের জন্য পৃথক আহারের স্থান নির্দিষ্ট ছিল। এই অপমান ও বৈষম্যের প্রতিবাদে রামাসামীর নেতৃত্বে জাতপাত বিরোধী আন্দোলনকারীরা হোটেলের বিজ্ঞাপন বোর্ড মোছার কাজ শুরু করতেই সমস্ত হোটেলের বোর্ডে 'ব্রাহ্মণ' বিজ্ঞাপণ একাংশের মালিকরা নিজেরাই মুছে ফেলতে শুরু করলেন। কিন্তু যে সমস্ত হোটেলের মালিকরা ব্রাহ্মণ ছিলেন তারা আন্দোলনকারীদের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে লাগলেন। আন্দোলনকারীরা তখন সরকারের কাছে এইসমস্ত হোটেল রেস্তোরাগুলি নিষিদ্ধ করার দাবি তুললেন। কিন্তু সরকার আন্দোলনকারীদের এই দাবিতে কর্ণপাত করলো না।

উত্তেজনা বাড়তে থাকায় 'পেরিয়ার' রামাসামী ঘোষণা করলেন, —ব্রাহ্মণরা যে উপবীত পরেন তা হল তথাকথিত উচ্চজাতের পরিচয় বহন করা প্রকাশ্য প্রতীক, যা আসলে নিম্নবর্ণ বলে চিহ্নিত মানুষদের অপমান করে, তাই সেগুলি দেখলেই কেটে ফেলতে হবে। ৯ই জুলাই ১৯৫৭ তিনি চিদাম্বরমে আয়োজিত এক জনসমাবেশে বললেন, "জাতপাতের বিনাশের প্রথম পদক্ষেপ হল, সেই সমস্ত চিহ্নগুলি ছুঁড়ে ফেলা যা একজনের জাত প্রকাশ করে। জন্মগতভাবে তথাকথিত উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের যে ধারণা তা সমস্ত মানুষের মাথা থেকে একদম বের করে দেওয়া উচিত। এবং যদি দরকার পড়ে এই কাজ করতে প্রয়োজনে অনমনীয় প্রচার আন্দোলন ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে আমাদের কয়েক হাজার আন্দোলনকারীকে যদি জেলবন্দি করা হয় অথবা ফাঁসিতে ঝোলানো হয়, তাতে কিছুই যায় আসে না। কারণ একমাত্র এই ধরনের আত্মত্যাগের মূল্যেই আগামী প্রজন্ম জাতপাত-ব্যবস্থার অশুভ কবল থেকে মুক্ত হতে পারে।"[৫৭]

কংগ্রেস এই সময় 'দ্রাবিড়-কাঝাগম'কে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলে। কংগ্রেসের এই বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করে রামাসামী সারা রাজ্যজুড়ে গান্ধি-মূর্তি ভাঙার হুমকি দেন। দ্রাবিড় কাঝাগমের আন্দোলনকারীরা কিছু জায়গায় ব্রাহ্মণদের উপবীত জোর করে কেটে দিলে, ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণীয়রা ক্ষেপে ওঠে। কোথাও কোথাও তারা আন্দোলনকারীদের উপর হামলা

চালায়। প্রতিবাদে আন্দোলনকারীরাও ব্রাহ্মণদের উপর আক্রমণ করে এবং ঘোষণা করে, — 'যদি আপনারা একই সময়ে একজন ব্রাহ্মণ ও একটি বিষধর সর্পকে দেখেন, তাহলে অবশ্যই প্রথমে অধিক বিষধর হিসেবে ব্রাহ্মণটিকে হত্যা করুন।'[৫৮] তামিলনাড়ু সরকার এই ঘটনার এই ঘটনার জন্য 'পেরিয়ার' রামাসামীকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিরুদ্ধে সরকার এই মর্মে মামলা করে যে, পশুপতি-পালয়ম, কুলিতলই ও তিরুচিরাপল্লিতে যে সমস্ত বক্তৃতা তিনি দিয়েছেন, সেখানে ব্রাহ্মণদের উপর হামলা করার জন্য উস্কানিমূলক মন্তব্য ছিল। এই মামলায় তিরুচিরাপল্লি জেলা আদালত তাঁকে ৬ মাসের কারাদণ্ড দেয়।

১৯৬৯ সালে 'পেরিয়ার' রামাসামী সমস্ত মন্দিরে জাতপাতগত ব্রাহ্মণ্যবাদী বিধিনিষেধ সম্পূর্ণ রূপে দূর করার জন্য নিম্নবর্ণীয়দের মধ্যে থেকে প্রতিনিধি ঠিক করে, তামিলনাড়ুর মূল মন্দিরগুলির গর্ভগৃহে প্রবেশের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। যারা মন্দিরে পূজা করতে চান, তাদের সকলকেই মন্দিরে পূজার সুযোগ দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। এবং সংস্কৃত মন্ত্র নয়, একজন নিজের মাতৃভাষাতেই পূজা করতে পারবেন, সরকারের কাছে তা নিশ্চিত করার দাবি জানান রামাসামী।[৫৯] পেরিয়ার রামাসামীর মন্দির প্রবেশ কর্মসূচি একাংশের দলিত আন্দোলনকারীদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছিল। পেরিয়ার রামাসামী উত্তরে বলেছিলেন, আমার উদ্দেশ্য মানুষকে ধার্মিক করে তোলা নয়, মন্দিরে প্রবেশের অধিকার সমস্ত মানুষের আছে এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করা এবং ব্রাহ্মণ্যবাদকে আঘাত করাই আমার উদ্দেশ্য।

১৯৭০ সালে 'পেরিয়ার' রামাসামী সমাজের সকল জাতের (Castes) মানুষের মধ্যে থেকেই হিন্দু-মন্দিগুলিতে পুরোহিত নিয়োগ করতে হবে, এই দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। নিম্নবর্ণের মানুষদের পুরোহিত হওয়ার ক্ষেত্রে সরকারিভাবে কোনো আইন তখনও ছিল না। প্রথানুসারে ব্রাহ্মণরাই ছিলেন বেশিরভাগ মন্দিরের পুরোহিত। এই আন্দোলনের পিছনে পেরিয়ারের যুক্তি ছিল, 'যখন অব্রাহ্মণদের দানের টাকায় মন্দির চলতে পারে তাহলে অব্রাহ্মণরা পৌরোহিত্যের কাজ করতে পারবে না কেন?' পূর্বের মতো আক্রমণাত্মক না হলেও ব্রাহ্মণ্যবাদী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তিনি পুনরায় প্রচার সংগঠিত করতে থাকেন। 'দ্রাবিড়-কাঝাগম' ঘোষণা করে, —এবার জোর করেই হিন্দু মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করা হবে এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হবে। এই ঘোষণার পরেই তামিলনাড়ুর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি আইনশৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কা করে 'পেরিয়ার' রামাসামীর সাথে আলোচনায় বসেন। এ বছরই তামিলনাড়ু বিধানসভা হিন্দু ধর্মীয় আইনে (Hindu Religious and Endowments Act.) পরিবর্তন এনে অব্রাহ্মণদের হিন্দু মন্দিরে পুরোহিত হওয়ার অধিকারকে আইনি স্বীকৃতি দেয়।

১৭ ডিসেম্বর ১৯৭৩ কুম্বাকোনমে একটি সভায় পেরিয়ার রামাসামী বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সেখানে তিনি বলেন, "আজকের বাস্তবতা হল, আমাদের আজও শূদ্র, অচ্ছুৎ ও বেজন্মা প্রভৃতি বলে গালি দেওয়া হয়। শুধুমাত্র হিন্দুশাস্ত্রগুলিই এই কাজ করে তা নয়, এই রাষ্ট্রের আইনও একই কাজ করে। দীর্ঘসময় ধরে দিনের পর দিন বছরের পর বছর আমরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে একই কথা বলে চলেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজও আমি এই সংগ্রামের গতি হ্রাস করার পরিবর্তে আরো তীব্র করার কথা বলছি, কেন?

গত বছর ১৯৭২ সালে, কিছু লোকজন আমাকে বলেছিলেন সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা অপসারিত হয়ে গেছে। আমি তাঁদের প্রশ্ন করতে চাই, তাই যদি হয় তাহলে আপনারা মন্দিরে গেলে কেন আপনাদের মন্দিরের মূল গর্ভগৃহের বাইরে দাঁড়াতে হয়? কেন আপনাদের দেবতাদের মূর্তি স্পর্শ করতে দেওয়া হয় না? আর যদি আপনারা কোনোভাবে মূর্তি স্পর্শ করে ফেলেন, তখন ব্রাহ্মণরা কেন বলে ওঠেন যে, মূর্তি অশুদ্ধ হয়ে গেছে?

আসলে আপনাদের বোকা বানানো হয়েছে। আইনিভাবে খাতায়কলমে জাতপাত-অস্পৃশ্যতা ভেদাভেদ নিষিদ্ধ হলেও মন্দিরগুলিতে অস্পৃশ্যতার ব্যবহারিক প্রয়োগ একইরকম আছে। তাই মন্দিগুলির অন্দরে অস্পৃশ্যতা নির্মূলীকরণের আন্দোলন আমরা আবার শুরু করেছি এবং সমস্ত মানুষকে মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্য উৎসাহিত করছি।"[৬০]

১৯ ডিসেম্বর ১৯৭৩ চেন্নাই এর ত্যাগরায় নগরে সমাজে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূরীকরণ নিয়ে একটি সভায় উপস্থিত ছিলেন ৯৪ বছরের 'পেরিয়ার' ই ভি রামাসামী। এই সভায় তিনি বলেন, "যখন আমরা আত্মমর্যাদা আন্দোলন শুরু করেছিলাম তখন আমাদের লক্ষ্য ছিল পাঁচটি। ঈশ্বর, গান্ধি, কংগ্রেস, ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যবাদকে ধ্বংস করা। এগুলির মধ্যে গান্ধি মারা গেছেন, কংগ্রেসও শেষ হয়ে গেছে, ঈশ্বরের অবস্থা এখন হাস্যকর। কিন্তু যখন আমরা সকলকেই পুরোহিত হওয়ার অধিকার দেওয়ার জন্য আইন তৈরি করতে চেষ্টা করেছি, ব্রাহ্মণরা সঙ্গেসঙ্গে তা নাকচ করেছে। আমাদের এই ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্রের পরিবর্তন করতে হবে।"[৬১] এটিই ছিল পেরিয়ারের শেষ বক্তৃতা। ১০ ডিসেম্বর ১৯৭৩ তাঁকে চেন্নাই মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। তারপর তাঁকে ভেলোর সি এম সি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ২৪ ডিসেম্বর সকাল ৭টা ২২ মিনিটে ৯৪ বছর বয়সে 'পেরিয়ার' ই ভি রামাসামী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শেষের কথা : 'Conssciousness of Oppression' হল একটি অশান্ত এবং বিক্ষুব্ধ করে তোলা চেতনা। এটা একটা এমন আদর্শ যা বিরাজেয়মান বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক (যা গড়ে ওঠার ভিত্তি উৎপাদন সম্পর্ক) যা সর্বদায় সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতি অংশের উপর নিপীড়ন করে টিকে আছে, তার পরিবর্তন চায়। কথাটা এভাবেও বলা যেতে পারে যে, নিপীড়িতের চেতনা বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিরাজেয়মান স্থবির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ধারণাগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, পুরনোর ধ্বংসসাধন ও নতুনের নির্মাণের আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয়। লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, দক্ষিণ ভারতের এই সামাজিক আন্দোলনগুলির লক্ষ্য শুধুমাত্র জাতপাত প্রথার সংস্কার ছিল না, বরং তা ছিল সমাজের অবহেলিত নিপীড়িত অংশকে রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদার করে তোলা এবং আর্থিক অধিকার অর্জন করার সংগ্রাম। সমাজের নিপীড়িত নিষ্পেষিত বর্গের মধ্যে থেকে উঠে আসা জাতপাত বিরোধী আন্দোলনের নেতারা ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নরম-গরম আন্দোলনের পিছনে থাকা জাতীয়তাবাদী মতাদর্শকে দেখেছিলেন হিন্দু-ধর্মীয় হায়রার্কিক্যাল আদর্শের পুনর্ব্যাখ্যা হিসেবে। ভারতরাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁদের মতামত ছিল, ব্রিটিশদের হাত থেকে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর।

আয়োদি থাসের পূর্বে শৈববাদী তামিল নেতৃত্ব ব্রাহ্মণ্যবাদী একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেও জাতপাত-ব্যবস্থাকে কোনোভাবেই আক্রমণ করেননি। তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সমীকরণে বিশ্বাসী। ঊনবিংশ শতাব্দতে আয়োদি থাসই প্রথম শৈববাদীদের এই সমীকরণের সমালোচনা করে, বৌদ্ধধর্ম এবং দ্রাবিড় বা 'প্রকৃত তামিল' পরিচয়ের ভিত্তিতে নিপীড়িত শ্রেণিকে একতাবদ্ধ করার রাজনীতিকে সামনে নিয়ে আসেন। 'শূদ্রাতিশূদ্র' পরিচয়কে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বিধান নির্ভর পরিচয় বলে সমালোচনা করেন তিনি এবং তার পরিবর্তে সরাসরিভাবে দ্রাবিড় পরিচয়কেই দক্ষিণ ভারতীয়দের প্রকৃত পরিচয় হিসেবে তুলে ধরেন। অর্থাৎ তামিল সমাজের অস্পৃশ্য নিপীড়িত অংশের আত্মপরিচয় নির্মাণে তিনি জ্ঞানতাত্ত্বিক ও সমসাময়িক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যা সে সময় অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে দক্ষিণ ভারতীয় নিপীড়িতের হারিয়ে যাওয়া মর্যাদাবোধ ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের পুনরুদ্ধার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। এই কারণে দক্ষিণ ভারতের নিম্নবর্ণীয় ও অস্পৃশ্য অংশের মানুষ হিন্দুত্ববাদকে অস্বীকার করে 'দলিত' নয় নিজস্ব জাতি পরিচয়েই পরিচিত হতে পেরেছিল।

পরবর্তী সময়ে আয়োদি থাসের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে উঠে আসা পেরিয়ার ই ভি রামাসামীর কর্মকাণ্ডের দিকে দৃষ্টি দিলে একই বিষয় চোখে পড়ে। বিংশ শতাব্দের সংস্কারক ও রাজনীতিজ্ঞ পেরিয়ার রামাসামী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, বিশিষ্ট গবেষিকা দেবী চ্যাটার্জি মন্তব্য করেছেন, ''ভারতে যুগ যুগ ধরে চলে আসা জাতপাত-বর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যাঁরা জেহাদ ঘোষণা করেছেন, তাঁদের মধ্যে পেরিয়ার ই ভি রামাসামীর নাম একটি উজ্জ্বল তারার মতো দীপ্যমান।''[৬২] ভারত ভূখণ্ডে হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে এই জাতপাত-বর্ণ ব্যবস্থা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতি মানুষের যে নিপীড়ন, অপমান, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা চাপিয়ে দিয়েছিল, দক্ষিণ ভারতে তার বিরুদ্ধে এক গঠনমূলক সংগ্রাম গড়ে তুলে, তিনি তাকে বিজয় অর্জনের পথে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে পেরেছিলেন। বর্ণবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি একটি মৌলিক যৌক্তিকতাবাদী ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ করেছিলেন এবং বাস্তব সমাজ জীবনে তার সার্থক প্রয়োগ করেছিলেন। শুধু কংগ্রেসকেই নয়, ভারতের কমিউনিস্ট নামধারী দলগুলিকেও কার্যক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন ই ভি রামাসামী। এ প্রসঙ্গে দেবী চ্যাটার্জি বলেছেন, ''তামিল ভূমিতে ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থা এখনো উচ্ছেদ হয়নি বটে, কিন্তু তাকে বড়রকমের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। গত কয়েক দশক ধরে যারা তামিলনাড়ুতে রাজত্ব চালাচ্ছেন, তাঁদের পেরিয়ারের নাম করে রাজত্ব চালাতে হচ্ছে, তাঁদের ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে শপথ নিতে হচ্ছে এবং তামিল জাতীয়তার পক্ষে দাঁড়াতে হচ্ছে। তামিলনাড়ুর অন্যান্য পশ্চাদপদ জাতের আন্দোলনের চাপে ভারত সরকার শিক্ষায় অন্যান্য পশ্চাদপদ জাতের জন্য ৬৭ শতাংশ সংরক্ষণ মেনে নিয়ে সংসদে আইন পাশ করতে বাধ্য হয়েছে — এই ঘটনা ভারতবর্ষের আর কোথাও ঘটেনি।''[৬৩]

পশ্চিমবাংলায় বসবাসকারী পশ্চাদপদ জাত-জাতিগুলিকে শিক্ষাক্ষেত্রে কোনোরকম সংরক্ষণ না দিয়েও একটি 'বামপন্থী' সরকার টানা ৩৪ বছর রাজত্ব চালিয়ে গেছে। পরবর্তী সরকারের ভূমিকাও একই। এ বিষয়ে দেবী চ্যাটার্জি মন্তব্য করেছেন, ''তামিলনাড়ুতে

'ওবিসি'দের সংরক্ষণ না দিয়ে কোনো সরকারের পক্ষে একদিনও রাজত্ব চালানো সম্ভব নয়। এটা অনস্বীকার্য যে, অন্তত তামিল ভূমিতে শূদ্ররা নিজেদের জন্য একটা জায়গা করে নিয়েছে।"[৬৪] এই জায়গা করে নেওয়ার অর্থ অবশ্যই রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করা। যা ভারত ভূখণ্ডের অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে খুব একটা দেখা যায় না।

সামাজিক - সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক এই তিন ক্ষেত্রে পেরিয়ার রামাসামী আত্মমর্যাদা আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে দ্রাবিড় জাতিসত্তার আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। ১৯১৭ সালের পর থেকে তিনি সর্বক্ষেত্রে নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত তামিলদের জন্য সম্প্রদায়গত সংরক্ষণের জন্য লাগাতার সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। যা ছিল জাতপাত ভিত্তিক জন্মগত শ্রমবিভাজনের কাঠামোকে ভাঙার একটা পদ্ধতি। আয়োদি থাস ও নারায়না গুরুর নেতৃত্বে বৃহৎ তামিলভূমিতে নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্যদের সমানাধিকারের দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল পেরিয়রের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আত্মমর্যাদা আন্দোলনের মধ্যে তা পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছিল বলা যায়। সেই ধারাবাহিকতাতেই পরবর্তীকালে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শূদ্রাতিশূদ্রদের শক্তিশালী সংগ্রামে সামিল হতে দেখা গেছে। এমনকি বর্তমান সময়ের তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক আদর্শের দিকে দৃষ্টি দিলে, পেরিয়ার ই ভি রামাসামী এবং তাঁর অগ্রজদের জাতপাত-অস্পৃশ্যতা বিরোধী ও ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী মতাদর্শকেই তার কেন্দ্রীয় জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দের দক্ষিণ ভারতীয় সমাজ সংস্কারকদের সফলতার জায়গাও ঠিক এখানেই।

আজ যখন ভারতরাষ্ট্রের ক্ষমতার মসনদে উগ্র-হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিবাদী শক্তি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, যখন নিম্নবর্ণ অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত মানুষ আর্থিক, সামাজিকভাবে তাদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে, তখন দক্ষিণ ভারতের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মতাদর্শ ও সংগ্রামী চেতনা নিশ্চিতভাবে আমাদের নতুন করে ভাবার কাজে প্ররোচিত করবে। একদিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের ৭৩ বছর পরও এখনো দেশের উচ্চপ্রশাসনিক বা শিক্ষা-গবেষণার ক্ষেত্রের পদগুলিতে তফসিল ভুক্ত নিম্নবর্গের মানুষ পৌঁছাতে পারছেন না। অন্যদিকে সমাজের নিপীড়িত অংশকে মুসলমান বিরোধী দাংগার কাজে ব্যাবহার করছে হিন্দু রক্ষণশীল শক্তি। গ্রাম মফস্বলে গেলে এখনো দেখা যাচ্ছে নিম্নবর্ণীয় ও অস্পৃশ্যদের ব্রাত্য করে রাখা হয়েছে। ভারত ভূখণ্ডের বহু হিন্দু মন্দিরেই নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্যদের প্রবেশের অধিকার নেই। ২০১৪'র পর উগ্র হিন্দুবাদী শক্তির শাসনাধীনে ভারতের বিভিন্নপ্রান্তে নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য মানুষরা জল জঙ্গল জমি জীবিকা থেকে উৎখাত হচ্ছেন। যে হিন্দু ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও বর্ণাশ্রম প্রথার বিরুদ্ধে জ্যোতিরাও ফুলে, সাবিত্রীবাঈ ফুলে, আয়োদি থাস এবং পেরিয়ার রামাসামীর মতো চিন্তাশীল মানবতাবাদীরা সংগ্রাম করেছিলেন আজ সমাজে সে সকল বিষয়ের বাড়বাড়ন্ত ভয়ানকভাবে দেখা যাচ্ছে। নিপীড়িত শ্রেণির মানুষ আজও ব্রাহ্মণ্যবাদী হেনস্তা ও অত্যাচারের স্বীকার হচ্ছেন। কোথাও কোথাও তাদের পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে।

২০১৪ সালে উগ্র হিন্দুত্ববাদী শক্তি ক্ষমতায় আসার পর গো-রক্ষার নামে বিভিন্ন হিন্দু-মৌলবাদী সংগঠনের হামলায় শতাধিক নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য (দলিত) ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুকে হত্যা করা এবং নিগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য বলছে, ২০০৯-২০১৪ পর্বের তুলনায় যা

১০,৩০০% বৃদ্ধি পেয়েছে। ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী রামন সিংসহ হিন্দুত্ববাদী নেতারা, কেউ খাদ্য তালিকায় গো-মাংস রাখলে তাকে হত্যা করার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছেন। ২০২০ সালে হিন্দু সমাজ কর্তৃক অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত সম্প্রদায়ের এক নারীকে ধর্ষণ করে খুন করে ফেলেছে উচ্চবর্ণীয়রা। উত্তরভারতে বহু জায়গায় নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য অংশের মানুষের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে।

উগ্রহিন্দুত্ববাদীরা ক্ষমতায় আসার পর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যুক্তিবাদী সত্যসন্ধানী মানবতাবাদী মানুষজনের উপর আক্রমণ বেড়ে চলেছে। এম এম কালবুরগি, নরেন্দ্র দাভালকার, গোবিন্দ পানসারে এবং সাংবাদিক সমাজকর্মী গৌরী লঙ্কেশকে হত্যা করেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। ভীমা-কোরেগাঁও মামলায় একাধিক মানবাধিকার অ্যাক্টিভিস্টকে জেলে আটক করেছে এই ফ্যাসিবাদী সরকার। তামিলনাড়ুর একাধিক জায়গায় পেরিয়ার ই ভি রামাসামীর মূর্তি ভাঙা ও রঙ লেপে দেওয়ার কাজ করেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভাঙা হয়েছে বি আর আম্বেদকরের মূর্তি। উত্তরপ্রদেশে সংগঠিত হয়েছে একাধিক ধর্মীয় ও জাতপাতগত দাঙ্গা। ২০২০'র ফ্রেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে সংগঠিত হয়েছে একতরফা ধর্মীয় গণহত্যা। সমাজে ধর্মীয় বিদ্বেষ, জাতপাতগত বিদ্বেষ, ভাষা বিদ্বেষ, জাতি বিদ্বেষকে তারা এমন জায়গায় নিয়ে গেছে যে নিজেকে ধর্ম-জাত-পরিচয়হীন মানুষ হিসেবে ঘোষণা করার ব্যক্তিগত অধিকারেও সোশ্যাল মিডিয়ায় আক্রমণ চালাচ্ছে হিন্দু মৌলবাদীরা। সম্প্রতি কৃষক আন্দোলন নিয়ে গ্রেটা থুনবার্গের পোস্ট শেয়ার করার 'অপরাধে' গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২১ বছরের পরিবেশকর্মী দিশা রাভিকে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লেখা 'কর্মযোগ' বইটি পড়লে দেখা যায় সেখানে 'বাল্মিকী' নামে এক 'অস্পৃশ্য' সম্প্রদায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "আমি বিশ্বাস করি না যে তারা কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্য এই কাজ করেন কোনো সময়ে তাদের কেউ একজন আলোকপ্রাপ্তির মাধ্যমে জেনেছে যে, সমগ্র সমাজ ও ভগবানের সুখের জন্য এই কাজ করে যাওয়াটাই তাদের জন্মগত কর্তব্য, তাই ভগবানের দ্বারা নির্দিষ্ট করা এই কাজ তাদের করে যেতে হবে, তাই মানুষের বর্জ্য আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ তাদের আধ্যাত্মিক কাজের অঙ্গ হিসেবেই শতাব্দের পর শতাব্দ ধরে করে চলা উচিত।"[৬৫] এখানে স্পষ্ট যে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং হিন্দু বর্ণ-বিভাজন ভিত্তিক শ্রমকে ভগবানের দ্বারা নির্দিষ্ট বলছেন এবং বাল্মিকী সম্প্রদায়ের শিক্ষা গ্রহণ ও যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে শ্রমের বিষয়টিকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করছেন। ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লা, 'অখিল ভারত ব্রাহ্মণ মহাসভায়' বলেছেন, "ব্রাহ্মণ সমাজ সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সমাজকে দিক নির্দেশ করেছে। শুধু অন্য সম্প্রদায়গুলিকেই নয় জাতীয় মূল্যবোধকেও প্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্তমান সময়েও গ্রামগুলিতে ধনিদের মধ্যে ব্রাহ্মণ পরিবারকে দেখা যায় কারণ ব্রাহ্মণের সেবা ও সমর্পণ তাকে এক উচ্চ স্থান দিয়েছে। আর এজন্যই একজন ব্রাহ্মণ জন্মগতভাবেই সমাজে পূর্ণ সম্মান পেয়ে থাকে।"[৬৬]

অর্থাৎ হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণরাই শ্রেষ্ঠ, এটাই বর্তমান শাসকের মূল দৃষ্টিভঙ্গি। মুখে তারা হিন্দু-ধর্মাবলম্বী অংশকে একত্রিত করার কথা বললেও আসলে হিন্দুদের উচ্চবর্ণীয় ও নিম্নবর্ণীয় বিভাজনকে শক্তিশালীভাবে প্রয়োগ করাই এই উগ্র-হিন্দুত্ববাদী শাসকের মূল

উদ্দেশ্য। এই উগ্র-হিন্দুত্ববাদীরা আসলেই অন্তরে মনুস্মৃতির অনুশাসনকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। দক্ষিণ ভারতের আয়াপ্পার মন্দিরে সুপ্রিম কোর্টের আদেশের পরও ঋতুমতী নারীদের ঢুকতে না দেওয়ার ঘটনা পূর্বোক্ত বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণ করছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীই যেখানে জন্মের ভিত্তিতে কর্ম ও বর্ণ বিভাজনকে শ্রম বিভাজনের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চান, এবং রামকে উগ্র-হিন্দুত্ববাদের আদর্শ পুরুষ হিসেবে তুলে ধরতে চান, তখন এটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, এই মনুবাদীরা আসলে নিম্নবর্ণ, অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত সম্প্রদায়, আদিবাসী এবং অন্যান্য অনার্য (যারা ইন্দো-ইরানিয়ান নন) জাতি-গোষ্ঠীগুলিকে দমন, দলন ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে একশ্রেণির ক্রীতদাসে পরিণত করতে চায়। এবং এ সবের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোহীন একদলীয় শাসন ব্যবস্থার অধীনে এক 'হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্থান' রাষ্ট্র নির্মাণ করতে চায়। যে 'হিন্দুস্থানে'র শাসক হবেন শুধুই উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা, অন্যদিকে তথাকথিত নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্যরা তথাকথিত উচ্চবর্ণীয়দের কৃপাপ্রার্থী নাগরিকে পরিণত হবেন। যা একবিংশ শতাব্দে দাঁড়িয়ে কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়।

তথ্যসূত্র :

১। Choudhury, K. 2019., *Essay– Sabitri Bai and Jyotiba Phule.*, Book-Jater Binash. pp. 16-17

২। *Ibid.* p-30-31.

৩। *Modern Dalit Thinkers, Essay.*

৪। *Ibid.*

৫। *Ibid.*

৬। Rosalind O. Hanlon., Caste, Conflict and Ideology, pp, 110-113.

৭। Kumar, Ravi., 2005, *Iyothee Thass and the Politics of Naming.* Essay

৮। Basu R.S., *Nandonars' Childern : The paraiyans Tryst with Destiny.* p.174.

৯। Teltumbde, Anand., *Dalit : Past Present And Future.*, p.57.

১০। Jeyaraj, K & Albaris J., 2018., *Iyothee Thass : A leader of Oppressed.* Research paper. UCRT.

১১। Aloysius, G., 2004. *Dalit Subaltern Emergence in Religio-Cultural Subjectivity, Iyothee Thassar and Emancipatory Buddhism.*

১২। Kumar, Ravi., *Ibid.*

১৩। Jeyaraj, K & Albaris J., 2018., *Ibid.*

১৪। *Ibid.*
১৫। *Tamillian.*, 16 December 1908.
১৬। Kumar, Ravi., *Ibid.*
১৭। Jeyaraj, K & Albaris J., 2018., *Ibid.*
১৮। *Ibid.*
১৯। *Iyothee Thasar Sinthanaigal.* (Tamil)
২০। *Ibid.*
২১। Jeyaraj, K & Albaris J., 2018., *Ibid.*
২২। *Ibid.*
২৩। Jeyaraj, K & Albaris J., 2018., *Ibid.*
২৪। Jeyaraman. B. 2013. *Periyar : A Political Biography.* p-11.
২৫। *Ibid.*, p-11.
২৬। *Modern Dalit Thinkers.* Essay.
২৭। Ranjan, P(Ed.)., 2020. *Jati byabastha our Prittisatta.* p.71.
২৮। Siddarth, M., 2018., *A study on Vaicom and Guruvayur Satyagraha.*, USSER.
২৯। Ramasamy, EV., Compiled by K. Veramani., *Thoughts of Periyar.* p.153.
৩০। *Ibid.*
৩১। *Ibid.*p.158.
৩২। Siddharth, M., 2018., *Ibid.*
৩৩। *Ibid.*
৩৪। Jeyaraman. B. 2013. *Ibid.* -15-17.
৩৫। Siddharth, M., 2018., *Ibid.*
৩৬। Jayaraman. B. 2013. *Ibid.* 15-17.
৩৭। Vaswanathan, E Sa., 1983., *The Political Carrer of E V R.*, pp. 45,46.
৩৮। Babu S. and Kandaswami, P., 2001. *Indian History Congress Research Paper.*
৩৯। Jayaraman. B. 2013. *Ibid.* p-17,18.
৪। Vaswanathàn, E Sa., 1983., *Ibid.*, p-51.
৪১। *The Hindu* 4 May 1925.
৪২। Rajadurai, S. V and Geetha, V. 1999. *Suyamariyathai Samatharmam Kovai.* p-2.
৪৩। Jeyaraman. B. 2013. *Ibid.* p-10.

৪৪। *Kudi Arasu.* 2 May 1925. 1st issue.

৪৫। Chatterjee, Devi., 1998. *Nari Adhikar Prasange Periyar (Periyar on Women Rights.) Introduction*

৪৬। *Kudi Arasu.*, 5 and 12 September. 1927.

৪৭। T A V, Nathan (Ed.) 1929. *The Justice Year Book.* p-120.

৪৮। *Ibid.* p-131.

৪৯। *Revolt,* 10 April 1929.

৫০। Robert L. Hardgrave Jr. *The Nadars ofTamilnad : The Political Culture of a community of Change.*

৫১। E Thuston. *The Caste And Tribes of South India.* Vol-1. P. 5-10.

৫২। *Ibid.* p. 125-128.

৫৩। Census report of India. 1931.

৫৪। E Thuston. Ibid. vol-5. pp. 472-473., Vol-6. pp. 114-115.

৫৫। Robert L. Hardgrave Jr. *The Nadars ofTamilnad : The Political Culture of a community of Change.*

৫৬। Jeyaraman. B. 2013. *Ibid.* p-73

৫৭। *Ibid.*, p.81.

৫৮। *Ibid.*, p.82.

৫৯। Ranjan, Pramod(Ed.)., *Ibid.*, p.148.

৬০। *Youtube Speech of Periyar E V R(Tamil).*, Translated by Narendran Ganapathy.

৬১। Jeyaraman, B., 2013. *Ibid.*, p.96.

৬২। Chatterjee, Devi., 1998. *Ibid.*

৬৩। *Ibid.*

৬৪। *Ibid.*

৬৫। Bandyopadhyay, S., 2020., Essay. *Hindutyabady Merukoroner Rajniti : Oitihasik Prekkhapot O Samasamay. Book. Dhormiya Merukoroner Rajniti O Bortoman Bhatrat.*, Ed. Rakesh Roushan. p.68.

৬৬। *Ibid.* p.68.